হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

নলহাটী, বীরভূম

প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব বর্ণনায় শ্রী বিপ্লব ওঝা

হীরালাল ভকত কলেজ পরিবারঃ শিক্ষাকর্মীগণের
সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক ডঃ গৌতম সেন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

পত্রিকা সম্পাদক

অধ্যাপক অয়ন্তিকা সরকার

বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জ্জী, ইংরাজী বিভাগ

ডঃ ইন্দ্রনীল মন্ডল, ভূগোল বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক পিঙ্কি দাস, অধ্যাপক এম. জামান

অধ্যাপক কৃতিমান বিশ্বাস, অধ্যাপক বিমান সাহা

অধ্যাপক অমৃতা বিশ্বাস, অধ্যাপক সুদীপ্তা সিংহ

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক

শ্রী ধনপতি মন্ডল, প্রধান করণিক

:: বন্দেমাতরম্ :: বন্দেমাতরম্ ::

শিক্ষার প্রগতি ঃ সংঘবদ্ধ জীবন ঃ দেশপ্রেম

শিক্ষার সর্বস্তরে দুর্নীতি এবং শিক্ষা বিরোধী
পরিবেশ দূর করতে
ছাত্রছাত্রীগণ
সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হন।

হীরালাল ভকত কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা

দিশারীর সাফল্য কামনায়

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ঃঃ নলহাটী ঃঃ বীরভূম

হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী, বীরভূম

পরিচালন সমিতি

শ্রী বিপ্লব ওঝা	ঃ	সভাপতি, পরিচালন সমিতি, সমাজ সেবক
ড. দেবব্রত সাহা	ঃ	ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং সম্পাদক (সময়সীমা - ১০/০৭/২০১৫ থেকে ০৭/০৩/২০১৯)
ড. গৌতম সেন	ঃ	ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং সম্পাদক (সময়সীমা - ০৮/০৩/২০১৯ থেকে বর্তমান)
শ্রী আবু বক্কর সিদ্দিকী	ঃ	ডি. পি. আই. প্রতিনিধি প্রাক্তন বিদ্যালয় শিক্ষক
শ্রী সুপ্রিয় ঘোষ	ঃ	ডি. পি. আই. প্রতিনিধি, বিদ্যালয় শিক্ষক
শ্রী অঞ্জন রায়চৌধুরী	ঃ	হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল প্রতিনিধি, সমাজ সেবক
ড. কৃষ্ণ ধীবর	ঃ	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, রামপুরহাট কলেজ
ড. কোয়েল পাল	ঃ	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, বীরভূম মহাবিদ্যালয়
অধ্যাপক পিন্টি দাস	ঃ	শিক্ষক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী	ঃ	শিক্ষক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
অধ্যাপক সৈয়দ এম জামান	ঃ	শিক্ষাক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
শ্রী অসীম কুমার ভড়	ঃ	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
মহঃ বাসিরুদ্দিন	ঃ	ছাত্র সংসদ প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ

পাঠদানে ব্রতী যাঁরা

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ঃ ড. দেবব্রত সাহা (সময়সীমা - ১০/০৭/২০১৫ থেকে ০৭/০৩/২০১৯)

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ঃ ড. গৌতম সেন (সময়সীমা - ০৮/০৩/২০১৯ থেকে বর্তমান)

বাণিজ্য বিভাগ

ড. রঞ্জিত কুমার সরকার, সহযোগী অধ্যাপক অর্থনীতি।

অধ্যাপক সলিল কুমার সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক।

ড. বংশীধর সাহু, সহকারী অধ্যাপক

(বিভাগীয় প্রধান)।

শ্রী সুখেন কুমার মন্ডল, অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রী গৌতম কুমার মন্ডল অংশকালীন অধ্যাপক।

বাংলা বিভাগ

ড. চৈতন্য বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক।

অধ্যাপক পিন্টি দাস, সহাকারী অধ্যাপক বিভাগীয় প্রধান।

শ্রীমতি গৌরী হোড়, অতিথি অধ্যাপক।

ইংরেজী বিভাগ

ড. গৌতম সেন, সহযোগী অধ্যাপক এবং

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপক।

শ্রীমতি সুদীপ্তা সিংহ, সহকারী অধ্যাপক এবং

বিভাগীয় প্রধান।

অধ্যাপক আব্দুর রেকিব, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রীমতি দেবারতী চ্যাটার্জী অতিথি অধ্যাপক (প্রাতঃ)।

সংস্কৃত বিভাগ

অম্বিকা সরকার, সহাকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

শ্রী অতনু ভট্টাচার্য্য, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রীমতি সুনন্দা বিষ্ণু, অতিথি অধ্যাপক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

অধ্যাপক এস. এম. জামান, সহকারী অধ্যাপক।

অধ্যাপক বিমান সাহা, সহকারী অধ্যাপক এবং

বিভাগীয় প্রধান।

শ্রী নীলমণি মুখোপাধ্যায়, অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রীমতি তনুশ্রী সিনহা, অংশকালীন অধ্যাপক

(প্রাতঃ বিভাগ)।

রাইহানা নাসরিন, অতিথি অধ্যাপক।

ফাহাদুদ্দিন, অতিথি অধ্যাপক।

ইতিহাস বিভাগ

অধ্যাপক সুকুমার মন্ডল, সহযোগী অধ্যাপক।

অধ্যাপক অমৃতা বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক এবং

বিভাগীয় প্রধান।

শ্রী নেকশাদ খান, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী বাবর আলি অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী কাজেম মন্ডল অতিথি অধ্যাপক (প্রাতঃ বিভাগ)।

ভূগোল বিভাগ

ড. ইন্দ্রনীল মন্ডল, সহকারী অধ্যাপক এবং

বিভাগীয় প্রধান।

ড. নীলাদ্রি দাস, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী শুভাশিস সূত্রধর অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী ইন্দ্রজিৎ মন্ডল অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী চন্দন ঘোষ অতিথি অধ্যাপক।

দর্শন বিভাগ

অধ্যাপক স্বপন সাহা, সহকারী অধ্যাপক এবং

বিভাগীয় প্রধান।

অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, সহকারী অধ্যাপক।

শ্রী অরুনাভ দাস, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রীমতি সুচিত্রা দাস, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী সফিকুল ইসলাম, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী রণজয় খান অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রীমতি তনুশ্রী দাস অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রী নাজমুল হাসান, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রীমতি মৌমিতা ব্যানার্জী, অতিথি অধ্যাপক

(প্রাতঃ বিভাগ)।

পরিবেশ বিভাগ

অধ্যাপক কৃত্তিমান বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক এবং

বিভাগীয় প্রধান।

শ্রীমতি তাপসী মুখোপাধ্যায়, অংশকালীন অধ্যাপক।

শারীরশিক্ষা বিভাগ

শ্রী বর্ষণ ঘোষ, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রীমতি সুমনা ঘোষ, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী তপন মন্ডল, অতিথি অধ্যাপক।

উর্দু বিভাগ

ড. বাবুল আলম, অতিথি অধ্যাপক।

গ্রন্থাগারিক

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রী আশিক মন্ডল, অতিথি অধ্যাপক।

কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

শ্রী সেখ হানিফা, অতিথি অধ্যাপক।

শিক্ষা সহায়ক কর্মীবৃন্দ

শ্রী ধনপতি মন্ডল, প্রধান করণিক।

শ্রী সুভাষ ভৌমিক, হিসাবরক্ষক।

শ্রী অসীম কুমার ভড়, ক্যাশিয়ার।

শ্রী মলয় মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার করণিক।

শ্রী ইন্দ্রজিৎ কুমার সাউ, টাইপিস্ট ক্লার্ক।

শ্রী শিশির দাস, করণিক।

শ্রী হুমায়ুন কবীর, ইলেক্ট্রিসিয়ান।

শ্রী পিন্টু কুমার মল্লিক, করণিক।

শ্রী বিপ্লব কুমার মারান্ডি, করণিক।

শ্রী আব্দুল আমিন, ক্যাসুয়াল অফিস বেয়ারার।

শ্রী পরেশ কুমার পাল, দারোয়ান।

শ্রী কৃষ্ণগোপাল লাহা, অফিস বেয়ারার।

শ্রীমতি কৃষ্ণা নাথ, লেডি অ্যাটেন্ডান্ট।

শ্রী গনেশ প্রসাদ সাহানী, জেনারেটার অপারেটর।

শ্রী চন্দ্রশেখর লেট, লাইব্রেরী অ্যাটেন্ডান্ট।

শ্রী গোবিন্দ ফুলমালী, ল্যাব অ্যাটেন্ডান্ট।

শ্রী নিখিল কুমার ফুলমালী, অংশকালীন সুইপার।

শ্রী তকবীর সেখ, অংশকালীন সুইপার

শ্রী রমেশ মাল, অংশকালীন গার্ড।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে .....

..... অকালে ঝরে গেছে যে সম্ভবনাময় মুখগুলি .....

..... দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন যে অতন্দ্র প্রহরীরা .....

...সমাজকে সুন্দর ও সুস্থ করার কামনায় প্রতিনিয়ত আত্মনিবেদন করা চলা সমাজসেবীরা ...

..... অগণিত জ্ঞানী মানুষ যাঁরা নিজেদের গুণের সৌরভে ভরিয়ে রেখেছিলেন চারিপাশ .....

..... অভিভাবকপ্রতিম সেইসব মানুষেরা যাঁরা বিপন্ন সময়ে ছিলেন শান্তির বার্তাবাহী ...

.....প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে নিভে গেছে যে তাজা প্রাণগুলি .....

– প্রাণশক্তির নিবীত নিষ্কম্প শিখাসহ মৃত্তি প্রদীপটি

প্রজ্বলিত থাকুক চিরকাল, এটুকুই প্রার্থনা।

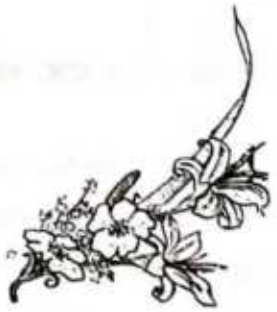

সভাপতির প্রতিবেদন

হীরালাল ভকত কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'দিশারী'-র প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমার এই প্রতিবেদন। সারস্বত সাধনার অন্যতম পীঠস্থান হীরালাল ভকত মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়ের একজন সদস্য হিসেবে সকল অধ্যাপক শিক্ষাকর্মী ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ প্রত্যেককেই জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দীর্ঘ বেশ কিছুদিনের ব্যবধানের পরে 'দিশারী' প্রকাশ পেতে চলেছে। আশা করবো ভবিষ্যতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই পত্রিকা প্রকাশ পাবে। উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলুক এই পত্রিকা। পত্রিকা কেবলমাত্র লেখাপ্রকাশের ক্ষেত্র নয়, আরও বিশদে বললে, শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের আধার। তাদের কল্পনা, চিন্তা-ভাবনা এতে প্রকাশিত হয়। আজকের কোরক আগামী দিনের সুরভিত পুষ্প।

হীরালাল ভকত মহাবিদ্যালয়ের কলেবর দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ বিভাগ দিয়ে শুরু করে কলা বিভাগ এবং বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগ ও চালু হয়েছে। কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিরলস প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এই কলেজ NAAC এর পরিদর্শক দলের কাছ থেকে 'B' Grade পেয়েছে। RUSA -র প্রদত্ত পরিকাঠামো অনুযায়ী মডেল কলেজে উন্নীত হবে আর কিছু দিনের মধ্যেই। এই কলেজের মুকুটে যোগ হল সাফল্যের আরেকটি পালক।

সেমেস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে কলেজের পড়াশুনো, আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষ আরো বেড়ে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার চাপ হয়তো বেড়েছে কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রত্যেকে তাদের সহায়তার জন্য সচেষ্ট। শুধুমাত্র শিক্ষা নয়, নানারকম 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। NCC এবং NSS এই কলেজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা। সামাজিক সচেতনামূলক নানা কাজে অধ্যাপকদের ছত্রছায়ায় এই দুটি বিভাগের ছেলেমেয়েরা নিরন্তর নিয়োজিত।

কলেজের প্রাঙ্গণে তৈরী হয়েছে নতুন মঞ্চ। নানা ধরণের অনুষ্ঠান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কলেজে সৌন্দর্যায়ণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনেকখানি।

বর্তমানে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হলেন ডঃ গৌতম সেন মহাশয়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে, এ কলেজের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এবং বর্ষীয়ান অধ্যাপকগণের অভিজ্ঞত তরুণ অধ্যাপকদের উদ্দীপনায় দিকে দিকে এই কলেজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক সর্বাঙ্গীণ ভাবে এই কামনা করি।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলবো যে, শিক্ষাগ্রহণ তাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক বিবিধ বিষয়ে তাদের সচেতন হতে হবে। কারণ শুধু সাক্ষর নয়, ডিগ্রিধারী নয় - প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আলোকিত মানুষই সমাজের ভিত ধরে রাখেন। শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, সবার সাথে, সবাইকে নিয়ে থাকার মধ্যেই তো প্রকৃত আনন্দ।

পরিশেষে 'দিশারী' র জন্য জানাই আন্তরিক শুভকামনা।

তারিখ - ০১/১০/২০১৯
নলহাটী, বীরভূম

শ্রী বিপ্লব কুমার ওঝা
সভাপতি
পরিচালন সমিতি
হীরালাল ভকত কলেজ
নলহাটী, বীরভূম

NCC বিভাগের আলোচনা সভা

প্রতিবেদনের পাতায়

"আমার মাথা নত করে দাও হে আমার চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডোবাও চোখের জলে।।"

জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আকস্মিকতার কোনো স্থান নেই। রসের ক্ষেত্রেই হোক বা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক, সর্বত্র একটা ধারাবাহিকতা আছে, কোথাও তা প্রকট কোথাও বা প্রচ্ছন্ন। প্রকৃতিতে দেখি যখন প্রয়োজন হয় নূতন জীবনের তখন জলে, স্থলে, আকাশে বাতাসে চলে বিপ্লব। নব সৃষ্টির জোয়ারে আসে কালবৈশাখী। আর তার পিছনে থাকে একাধিত মানুষের একক ও সম্মিলিত ধারণা। দুটি স্রোতের মিশ্রণে তৈরী সমাজের চির প্রবাহিত ধারা। একটি ভাঙনের কুল ডোবানো বন্যা, অন্যটি সৃষ্টির পরিপালিত স্রোত, যে সৃষ্টি কখনো রূপ পায় কথায়, কখনো বা লেখায়। এই লেখার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম পত্রিকা। যা সার্থক করে মনের অন্দরমহলের ভাবনাকে।

জ্ঞানের তপস্যা আজকের নয়, চিরকালের। যুগ যুগ ধরে জ্ঞানপ্রদীপের নিচে মানুষকে হার মানতে হয়েছে বার বার। সেই জ্ঞানেরই এক ক্ষুদ্র রূপ 'দিশারী'। অন্তরসূর্যের এক জ্বলন্ত প্রকাশ দিশারী। যার ওটি ওটি পথ চলা হিরালাল ভকত কলেজের মানুষের আশির্বাদ আর ভালোবাসাকে সঙ্গে নিয়ে। আমি গর্বিত এই পত্রিকার এককোণে একটু জায়গা পেয়ে।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ যেমন দিশারীর গর্ভে স্থান পায় তেমনি অকপট জবানীতে পত্রিকার কাগজ ভরাট হয়। উন্মেষিকতার প্রকাশ এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নয়, সারা বছরের ক্লাসমুখী অধ্যয়নের বাইরে হৃদয়ের সৃষ্টিশীলতা তুলে ধরাই পত্রিকার লক্ষ্য। স্মৃতির জাবর কাটলে হয়তো বিগত অনুভূতির শরিক হতে পারব আমরা সেই অনুভূমিকে সঙ্গেই সার্থক হোক আজকের পত্রিকার পথ চলা।

জ্ঞানে অজ্ঞানে পত্রিকার ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। পত্রিকার প্রকাশে যাঁদের ধারাবাহিক চিন্তা প্রতিফলিত তাঁদের কুর্নিস জানাই, কুর্নিস জানাই সেই সব মানুষদের যাঁদের উপলব্ধির সামান্য বিচ্ছুরণে দিশারী আজ মহীরুহ। কুর্নিস সেই অনুভূতিগুলোকে যাঁদের পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া অতল তলে হারিয়ে যেতো এই পত্রিকার সব ভাবনা, সব সাধনা। ড. চৈতন্য বিশ্বাস, হ্যাঁ নামটা খুব গম্ভীর কিন্তু এই গম্ভীরতার আড়ালে এই জীবন্ত সৃষ্টিসত্তা বিরাজিত যা হয়তো প্রকাশিত হতো না যদি দিশারীর জন্ম না হতো। আমার বন্ধুবর শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী ও গৌতম সেন যাঁদের সক্রিয়তা ছাড়া এই ভাবনা অন্ধকার গলিতে হারিয়ে যেতো।

তাই সবশেষে বলি, সার্থক হোক কলমের কালি, সার্থক হোক সকলের প্রকাশ না হওয়া অনুভূতি আর এই সার্থকতাকে সাথে নিয়েই হাজার বছর বেঁচে থাক দিশারী।

দেবব্রত সাহা
প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী

MESSAGE FROM THE TEACHER-IN-CHARGE

I feel honoured and proud to present this annual college magazine for the Session 2018-19 to my dear students. For the last few years we have been trying heart and soul to uplift the quality not only of the service to the students but also of the magazine. We have been trying to lead the students to an all-round development of character and talent. We have been, in addition to imparting curriculum-based and value-based education, trying to spot new talents and nourish the old through a variety of extracurricular activities including publication of wall magazines, organization of cultural programmes and festivals and outreach programmes of the NSS and NCC. This college magazine is an important part of the whole process. From the very outset, it has been emphasized that originals writings should be given preference, since, as a literary-cultural product, the magazine has the chance to travel through hands and reach people who are not at all connected with us. Thus, the magazine, in a way, will introduce us to a class of readers who have never seen us, known us and heard us. In a nutshell, it will let them know the way we think and the way we nourish the talent among students.

But, it is also a matter of regret that in spite of possessing the literary knack, the contributors to the magazine-here, mainly students-are much less in number than expected. This is alarming to us. This trend can never be let to sustain itself. I hope that we will, in the next session, be able to get over this demoralizing picture.

I express my sincere wishes to all the contributors and my sincere thanks to my dear colleagues who have given their best to get the best of this magazine.

Dr. Gautam Sen
Teacher-in-Charge

Message from the Desk of the Magazine Committee

Hiralal Bhakat College has recorded thirty two years of constant development, in the course of which it has accomplished much, making it one of the colleges recognized for its excellence and therefore, much sought after by the fresh applicants. The tradition of the college happily brings together sound academic achievement with an extensive and vibrant co-curricular programme that includes sports and leadership training programmes. Our mission is to inculcate the love of knowledge in our students and for this we aim to develop the skills and demeanour of lifelong 'learning,' essential for making responsible global citizens. This will make them immensely capable of facing the future with resilience and optimism. On the deeper level, we try to instil the values of respect and trust in relationships that are the foundation of real success.

At HiralalBhakat College we believe that 'education' is a holistic exercise and as such we strive to give a whole new meaning to the word. Coupling this basic premise with the idea of a sense of belonging to one family-the HBC family-we look at ourselves as 'care-givers.' We care for the mind-ours is a sterling academic institution; we care for the person-the accent is on the all-round development of personality. Dishari is one of the ventures that aim at our desiredall-round development. It is one of the most prominent mediums of expression of our institution. I wish long life, regular publication and novel identity of this intellectual offspring of our HBCfamily.

Dr. Suddhaswatta Banerjee
Member of Magazine Committee
Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum.

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে.....

সাহিত্যের প্রাঙ্গণে 'দিশারী'র প্রকাশ আলোকিত করে তুলুক চারিপাশ। সমস্ত অন্ধকার ধুয়ে যাক আলোর ঝর্ণায়, মুছে যাক মানবমনের যাবতীয় কালিমা - চিরভাস্বর হয়ে থাক আমাদের সবার প্রিয় 'দিশারী'।

'দিশারী' হীরালাল ভকত মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা, যেখানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সুযোগ পায় প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে বেড়িয়ে নিজেদের মনন সৃজনের সম্পদগুলি সবার সামনে প্রকাশ করার। আত্মপ্রকাশে উন্মুখ শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিতে ভরে ওঠে 'দিশারী'র ডালি। নবীন প্রাণের সৃষ্টি, তাদের কল্পনাকে কল্পনাকে ব্যক্ত করার সুযোগ পায় তারা কখনোও গল্প-কবিতার মাধ্যমে আবার কখনো বা দেশের ও দশের নানাবিধ বিষয়ে সচেতন ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অমূল্য চিন্তা ভাবনাকে প্রকাশ করে প্রবন্ধের মাধ্যমে।

শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ প্রত্যেকেই তাঁদের জ্ঞানের প্রদীপ, তাঁদের অনন্য অভিজ্ঞতার কথা বলে দিশারীকে করে তোলেন অনন্যা।

শিক্ষায় সংস্কৃতিচর্চায়-ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বত্র আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখুক সর্বান্তঃ করণে এই কামনা করি। নতুন কিছু সৃষ্টির আনন্দে উদ্ভাসিত হোক আগামী প্রজন্ম - দিশারী তারই একটি অন্যতম ক্ষেত্র।

আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপকদের স্নেহস্পর্শে সমৃদ্ধ 'দিশারী'। বিগত দুটি শিক্ষাবর্ষে নানা কারণবশতঃ এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। এই শিক্ষাবর্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বাগ্রে পত্রিকা প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। আমার প্রয়াস সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়, তাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ক্ষমাপ্রার্থী অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য। অনুতপ্ত তাদের প্রতি, যাদের লেখাকে 'দিশারী' সম্মানিত করতে পারেনি।

পাঠক ও গুণিজন সকল ত্রুটি নিজেদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে 'দিশারী' কে আপন করে নেবেন এ বিশ্বাস রয়েছে। শিক্ষক - শিক্ষার্থী - শিক্ষাকর্মী - অভিভাবক - পরিচালন সমিতির শিক্ষানুরাগের সঠিক সমন্বয়ে হীরালাল ভকত কলেজ ও তার 'দিশারী' পত্রিকা আরও সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি।

পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই পত্রিকা পরিচালন সমিতির সকল সভ্যকে, যাঁরা প্রতিনিয়ত আমার পাশে থেকেছেন, ভরসা দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন।

'দিশারী'র জন্য রইলো আন্তরিক শুভকামনা- 'শতফুল বিকশিত হোক'।

অয়ন্তিকা সরকার
সম্পাদক
'দিশারী'
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী

!! সূচীপত্র !!

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
○ সভাপতির প্রতিবেদন		৮ - ৯
○ প্রতিবেদনের পাতায়		১০
○ Message from the Teacher-in-charge		১১
○ Message from the Desk of the Magazine Committee		১২
○ পত্রিকা সম্পাদকের কলমে		১৩
◆ বসন্তের টানে	মনোজিৎ মন্ডল	১৮
◆ নবীন যৌবন	মেহেদি হাসান	১৮
◆ ফুটপাতবাসী	রমেন মাল	১৮
◆ ভারত আমার দেশ	শুক্লা ভাস্কর	১৯
◆ পোষাক	মোহাঃ এক্রামুল হক	১৯
◆ প্রবাসী জীবন	আয়াত আলম	২০
◆ আমার বাংলা ভাষা	মৈত্রী ব্যানার্জী	২০
◆ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রোজিনা খাতুন	২১
◆ তুমি সেই মা	অনিন্দিতা মন্ডল	২২
◆ স্যার	অর্পিতা মন্ডল	২২
◆ শ্রদ্ধাঞ্জলী	রোজিনা খাতুন	২৩
◆ লিখনে সমস্যা	করবী মন্ডল	২৩
◆ কবি নজরুল স্মরণে	সালমা জাহান	২৪
◆ বাস্তব	সুইটি খাতুন	২৪
◆ দুর্গা মা দুর্গা মা	সোনা দাস	২৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
◆ Independence we seek	Abdur Rakib	২৫
◆ ধাক্কা	ড. রঞ্জিৎ কুমার সরকার	২৮
◆ দেশ ভ্রমণ একটি শিক্ষা এবং দেশকে জানা	মোহাঃ এক্রামুল হক	৩৩
◆ এক যাত্রা পথে	হাসিনা খাতুন	৩৫
◆ নারী সুরক্ষা	ড. চৈতন্য বিশ্বাস	৩৯
◆ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বনাম শিক্ষক	ড. রঞ্জিৎ কুমার সরকার	৪৩
◆ The Religion of the Forest	Dr. Suddhasattwa Banerjee	৪৭
◆ সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা	সুকুমার মন্ডল	৫৪
◆ Toxic heavy Arsenic contamination	Kritiman Biswas	৫৭
◆ প্লাস্টিক	ড. বংশিধর সাহু	৬১
◆ উন্নয়নের পথে হীরালাল ভকত কলেজ	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৬৬
◆ Importance of Yoga	Swapan Saha	৬৮

রবীন্দ্রস্মরণীকা ২০১৯

কবিতা

রক্ত দান জীবন দান ঃ
রক্ত দানে নিরত কলেজের শিক্ষার্থীরা

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও ঃ
পোষ্টার আঁকায় ব্যস্ত ছাত্রীরা

NCC নৃত্যানুষ্ঠান

বসন্তের টানে

— মনোজিৎ মন্ডল
বি.এ. - প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স

বসন্তের কোকিলের মিষ্টি ডাকের মাধুর্য্যে,
জীবন ভরে যায় নির্মল পরশের সৌন্দর্য্যে।
কোথা থেকে ভেসে আসে আর মাধবীলতার গন্ধের বাহার,
যেন হৃদয়ে ডাক দিয়েছে আনন্দ-সুরের সেতার।
তারই মাঝেই দেখি শোভা,
তৃষ্ণাতুর মনে সুমধুর আভা।
প্রাণধারা আজ আবেগের টানে,
হে ঋতুরাজ অনুরাগের মালা পরাব তোমার গলে।

ফুটপাতবাসী

- রমেন মাল
বি.এ - সংস্কৃত অনার্স (সেমিস্টার-১)

কি কষ্ট তাদের, দেখো শহরবাসী।
এক মুঠো কোমল শিশু ক্ষুধায়
জ্বালায় করে হাহাকার।
দু-মুঠো দেয় না খাবার
তবু করে বড় হওয়ার অহংকার
এই কি বিচার?
আছে কত কোটি শহরবাসী
তবু কেন তাদের এত মাতামাতি।
আমিতো এক গ্রামবাসী
খাওয়া পরা ছাড়া আর নেই কোনো গতি,
ওগো ফুটপাতবাসী।

নবীন যৌবন

- মেহেদি হাসান
বি.এ - বাংলা অনার্স (সেমিস্টার-১)

এই তো পরীক্ষা
দিচ্ছে যে বাধা কত শারীরিক ক্রিয়া
তবু মনে লিপ্ত আজ শত শত দুষ্কর আশা।
এই তো বুঝি বয়সের দশা।
কত কী ভাবনা ঘুরছে চক্রাকারে আমার মনে
ভাবি কোন গোপন রহস্য আছে মনের গভীরে
কত জনের সাথে কত কী কথা হয়
সেটা বাস্তবে নয় কল্পনায়
এটা কি বয়সের দশা?
নবীন যৌবন উদ্দীপ্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে
মনকে পারি না আমি, যেতে চাই বহুদূরে
কত কী ভাবনা ঘুরছে চক্রাকারে
সারাদিন মন শুধু চঞ্চল বাতাসের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়
এটা বুঝি বয়সের দশায়?

পোষাক

মোহঃ এক্রামুল হক
বি. এ. জেনারেল, ১ম বর্ষ সেমেস্টার

অত দামের পোষাক চাই না মা আর,
দামী পোষাক পরলে হবে অহংকার।
পোষাকের অহংকারে কতজন চলে,
আমি তো মা যাবোনা তাদের দলে।
যারা অহংকারী, দরিদ্র বিমুখ,
তারা দামী বেশ পরে পরুক
আমি চাই দৈন্য দূর হোক সবার,
ভালো থাকুক সকল মিলে এ বিশ্ব মাঝার,
মানসিকতার বন্ধন আসুক আমাদের সবার।

ভারত আমার দেশ

- শুক্লা ভাস্কর
বি.এ - বাংলা অনার্স (সেমিস্টার-১)

ভারত আমার জন্মভূমি ভালোবাসার দেশ
এই দেশেতেই সবাই মিলে সুখেই আছি বেশ।
উত্তরে আছে হিমালয় রাজ
মাথায় তার শুভ্র সাজ।
দক্ষিণেতে সাগর রাণী
অপরূপ তার সৌন্দর্যখানি।
ভোরবেলার স্নিগ্ধ হাওয়া
মিষ্টি সুরে পাখির গাওয়া।
ফুলের সুবাস বলে এসে
সূর্য কিরণ দেয় যে হেসে।
রঙিন পাখার প্রজাপতি
করে ফুলে মাতামাতি
নদ-নদী আর গাছ গাছালী সোনার ধানের দেশ
এই আমাদের ভারতমাতা চির গৌরবময় সুখের দেশ।

প্রবাসী জীবন

— আয়াত আলম
বি.এ. - বাংলা অনার্স
(দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সেমিস্টার)

হায়রে জীবন, বিধির জীবন,
যারা মাতৃভূমি ছেড়ে
কাটায় প্রবাসী জীবন।
যারা মায়ের আদর বাবার শাসন
পায়না কিছুই সেথা,
বেদনা ভরা অশ্রু নিয়ে
পার যে কত ব্যথা।
যারা সকাল বেলা সূর্য দেখে
বেরিয়ে পড়ে কাজে,
অপরিচিতির ভিড়ে কেবল
তারা পরিচিত খোঁজে।
যারা স্বাদ পায় না নতুন হাওয়ার
নতুন ফুলের গন্ধে,
তাদের ঘর্ম ঝরে শুধু
সকাল থেকে সন্ধ্যে।
যাদের আসল হাসি লুকিয়ে থাকে
জন্মভূমির জঠরে,
যাদের মায়ার ক্ষুধার ছাপ ফেলেছে
চক্ষু দুটির কোটরে।
তাদের প্রতি রইল আমার
বুকের গভীর ভালোবাসা।

আমার বাংলা ভাষা

- মৈত্রী ব্যানার্জী
বি.এ. - বাংলা অনার্স, প্রথম

বাংলা ভাষা আমার কাছে নতুন একটা আশা
দূরে থেকেও কাছে পাওয়ার বড্ড ভালোবাসা
এখন দিনের দিদিমণিরা ম্যাডাম বলতে বলে
সুযোগ পেলেই বাংলা বলে মজার ছলে ছলে
এখন দিনের মাসি-পিসি হয়েছে যে আন্টি -
তবুও তো পড়ে থাকে বাংলার দিকে মনটি।
বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলায় বলি মাতা
ইংরেজি স্কুলে বলতে গেলেই বলে তোরা যাতা
ইংরেজিতে কথাগুলো কেমন শোনায় ফিকে
আমার বাংলা ছড়িয়ে পড়ুক চারি দিকে দিকে।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

ড্রাগ বিরোধী প্রচারে কলেজের ছাত্র- ছাত্রীরা

NCC আয়োজিত সেমিনার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

– রোজিনা খাতুন
বাংলা অনার্স

বলতে পারো কোন কবি সে
গাল ভরা তার দাড়ি।
কোথায় আছে গাছের ছায়ায়
ছোট্ট মাটির বাড়ি।
কে লিখেছে সহজ করে
প্রথম সহজ পাঠ
কার চরণের চিহ্ন রাঙা
ভুবন ডাঙার মাঠ।
ছোটো নদী যায় বয়ে ভাই
এক হাঁটু তার জল,
ছুটির দিনে পথ যে হারায়
ছোট্ট ছেলের দল।
বক্সিগঞ্জে হাটের পথে
চালিয়ে গরুর গাড়ি
বলতে পারো যাচ্ছে কারা ?
কোথায় তাদের বাড়ি ?
কোথায় আছে আম্রকানন
সাধের বকুল বীথি
নাম না জানা কত পাখি
মধুর কলগীতি।
ছোটো ছেলে হতে চায়
যে খেয়া ঘাটের মাঝি,
চাঁপায় বনে চাঁপা হয়ে
ফুটতে সবাই রাজি।
কে কিনেছে রথের দিনে
তালপাতার বাঁশি।
কে ফোটাল শিশুর মুখে
ফুলের মতো হাসি।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদে এল বান
এমন করে কে শোনাবে
ছেলে বেলার গান।
ছোট্টো অমল, ওর দুঃখে
ব্যথায় ভরে মন,
ছোট সুধা ছিল যে তার
নিজের আপনজন।
'বীরপুরুষের' সেই ছেলেটি
আমরা সবাই চিনি
এবার বলি বিশ্বকবি
রবীন্দ্রনাথ তিনি।

তুমি সেই মা

- অনিন্দিতা মন্ডল
বাংলা অনার্স

তোমার কোলে জন্ম নিয়ে
ধন্য আমি মা
তোমার মত ভালোবাসা কোথাও পাবো না
তুমি আমায় দেখালে যে
এই পৃথিবীর আলো,
তুমি ছাড়া আমার কাছে সব বস্তুই কালো,
ঈশ্বরের কাছে বলি তাই বারবার,
তোমার মতো মা পাই যেন পরজন্মে আবার
তোমার এই ঋণ মাগো
নেই শোধ করবার
তুমি আমার চন্দ্র সূর্য
তুমি আমার বিশ্ব,
তুমি আমার গুরু
আমি তোমার শিষ্য।

স্যার

– অর্পিতা মন্ডল
বিভাগ – বাংলা, তৃতীয় বর্ষ

প্রণাম জানাই স্যার আজ আপনারে
ছড়া. কবিতা. গানে ভরা ছিলেন অন্তরে।
কি লিখব? কাকে দেখাব? শুধু ভাবছি
আপনারে স্মরণ করে এই কবিতা লিখছি।।
যখনই লিখেছি – দেখেছেন ভুল ত্রুটি.
ছাত্র ছাত্রীর আকারে দেখিনি কোন ত্রুটি।।
লিখতে আজ কবিতা হাত কেন কাঁপে?
করতে সংশোধন দেখাব এখন কাকে?
ঈশ্বরের করুণাই পেয়েছি আপনার সান্নিধ্যে
জানিনা কি দেখেছি. কি ছিল আপনার মধ্যে?
অসুস্থ আজ শয্যাগত মোরা সবই জানি
সুস্থ হোন তাড়াতাড়ি এই প্রার্থনা মানি।।
লিখছি তবু কবিতা আজ –হোক না ভুলে ভরা
লেখার মাঝেই আজ স্যারকে মনে পরা।।
কলেজের অধ্যক্ষ আপনি সবার সি.বি. স্যার
সাহিত্যের জ্ঞানে ভরে দিয়েছেন ছন্দ অলংকার।
কে দেবে সাহস লেখার? কে দেবে আশ্বাস?
সবার সি.বি. স্যার আপনি চৈতন্য বিশ্বাস।।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

– রোজিনা খাতুন
বাংলা অনার্স

কর্মজীবন শেষ হয়েছে
এবার যাবে চলি
বিদায় বেলায় নাওগো তুমি
মোর শ্রদ্ধাঞ্জলি।
নীরব তোমার চক্ষু দুটি
অশ্রুতে ছল-ছল
বাঁধ ভাঙা মোর অশ্রুধারা
বইল কল-কল।
তোমার শিক্ষাদানে
মোরা হয়েছি ধন্য
শত ফুল বিকশিত করে
এখন হয়েছে বরেণ্য।
সূর্য উঠবে ফুল ফুটবে
গাইবে পাখি গান
আশা যাওয়ার পথের ধারে
শুনবো না তার তান
গ্রহণ করো মোর
হৃদয়ের অঞ্জলি
এর বেশি কিছু নাহি
জানালাম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লিখনে সমস্যা

– করবী মন্ডল
বাংলা অনার্স, ৩-য় সেমিস্টার

হঠাৎ একদিন কলেজে গিয়ে নোটিশ দেখে চমকে উঠলাম।
কারণ দেখলাম কলেজ পত্রিকা দিশারী বেরোচ্ছে
এই কয়েক দিনের মধ্যে
এই পত্রিকায় প্রকাশ পাবে গল্প, ছড়া বা কবিতা প্রবন্ধ ও রচনা।
স্যার বলেছেন এরই মধ্যে লিখতেই হবে যেকোন একটা।
তাই আমার বড়ো চিন্তা লিখবো কি করে
কিন্তু হবেই আমায় লিখতে যেকোন উপায়ে।
কত ভাবি ভেবেই হইগো সারা।
তাইতো আজ বসেছি আমি পেন খাতাটি নিয়ে
কবিতা বা ছড়া লিখবো এই আশাটি নিয়ে।
কত ভাবি কত ভাবি ভেবেই হয়গো সারা,
রাত কেটে যায় ভোর হয়ে যায় দেখি পুরো খাতাই সাদা।

কবি নজরুল স্মরণে

- সালমা আফরোন
বাংলা অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

ভারত মাতার মূর্ত প্রতীক তুমি কবি নজরুল।
মানব জাতির হৃদয়ে তুমি ঘুম জাগা বুলবুল।।
তোমার চলন যেথায় সেথায় একলা মাঠে ঘাটে।
তোমার পদধূলি আজও লেখা আছে ভারতের মাটিতে।।
তুমি বিদ্রোহী কবি, তুমি বিপ্লবী বীর।
তোমায় দেখে ভারতমাতা তুলেছে উন্নত শির।।
তুমি গেয়ে গেছো সেই সাম্যের গান।
যার জন্য ইংরেজরা হয়েছে অপমান।।
তাইতো তোমার মুক্তি আজ ভারতের মাটিতে।
তুমি চলে গিয়েও আজও রয়ে গেছো ভারত ভূমিতে।।

বাস্তব

- সুইটি খাতুন
বাংলা অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

বৃষ্টিরা ঝড়ে পড়ে মাটির বুকেতে।
তারারা ফুটে ওঠে আকাশের বুকেতে।
স্বপ্ন নেমে আসে ঘুমের দেশেতে।
জোনাকি ফিরে আসে রাতের দেশেতে।
ফুলের দেশে প্রজাপতি খেলা করে।
মায়ের কোলেতে শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে।
বন্ধুরা রয়ে যায় হাসি মজার মাঝেতে।
গুরুজনরা রয়ে যায় ভক্তি শ্রদ্ধার মাঝেতে।

দুর্গা মা দুর্গা মা

— সোনা দাস
বি. এ. সেমেস্টার, বাংলা অনার্স

দুর্গা মা দুর্গা মা
এসো তাড়াতাড়ি
না যদি আসো তবে
তোমার সাথে আড়ি
দশ দশটা হাত তোমার
একটিও নয় ফাঁকা
অসুর বধ করে এসে
আবার দিও দেখা
মন্দিরেতে তুমি তো মা
আসো আর যাও
তুমি প্রতি বছর মোদের
খুব আনন্দ দাও।

Independence we seek
(composed on the occasion of Independence Day 2018)

- Abdur Rakib
PART-TIME PROFESSOR IN ENGLISH (HONORARY)

We seek Independence
That's colourful like vibgyor in all ways,
As in the sunlight, round the Globe,
That can never brutalize Man and Mind.
Multilingual, Multiracial and Multicalibred,
It's the Nest of all colours;
It is to be vitalized with he Rays of Philanthropy.
It is to feed them, thee and us
And All with Honey of Fraternity.
We seek that Independence
That begets Love and Harmony
For all E-mail IDs; that bleed no blood.
We seek Independence to be suited to Rams and Rahims,
And to Radhas and Krishnas for the happy conjugation
Of all Races and Creeds to play Homage and Respect
To all the Martyrs and Dedicators
Who had eagerly intended to turn the Earth into Heaven.
And Dost thou seek Independence,
Doth they.....
Do we, the politicians of post Independece Days, seek
To martyrise us
O ! Our Great Motherland!
Do we seek to kill our own concern and our own loaf and fish?
For the Grand Independence.....?
We seek and sought Independence from the deepest core of our heart
But for whoms and for whats.....

গল্প কথা

ড. বিমান সাহার তত্ত্বাবধানে NSS এর উদ্যোগে কলেজে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

কলেজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অধ্যাপক কৃতিমান বিশ্বাস, অধ্যাপক স্বপন সাহা ও মাননীয় শিক্ষকদ্বয়

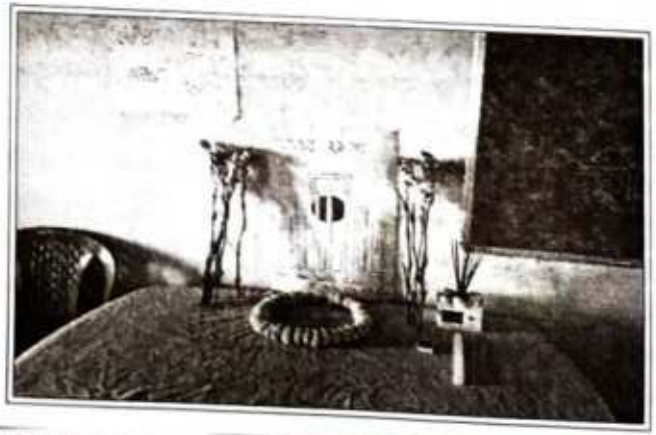

"ধাক্কা"

ড. রঞ্জিৎ কুমার সরকার
সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি)

গতকাল সারা রাত্রি ভাল করে ঘুমই হল না হরিদপর। তাই ভোর হতে না হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। স্ত্রী নির্মলা তখনও গভীর ঘুমে। নিজেই বিছানা ছেড়ে ভোরবেলার প্রাত্যহিক কাজকর্ম সারতে লাগলেন। পাড়াটা তখনও চুপচাপ, শান্ত ও নিঃস্তব্ধ। ভোরবেলার এই পরিবেশটা খুব ভাল লাগে হরিপদর একটু পরেই পাড়াটা জেগে উঠবে নানা রকম শব্দে ও কলকোলাহলে। প্রাত্যহিক কাজকর্ম সেরে পূর্বদিকে বারান্দায় রাখা পাড়ার টেবিলে এসে বসলেন। একটু পরেই পূর্বদিকে লাল হয়ে সূর্যদেব উঠে পড়লেন গতকাল থেকেই মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। আজ দুপুর বারোটায় স্কুলের মিটিং, সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য সেইজন্য মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে তার। এই সভায় তিনি কি বলবেন আর কি বলবেন না এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে স্মৃতির সরণীর পিছনদিকে হাঁটতে শুরু করলেন হরিপদ।

হরিপদ ঘোষ শ্রীখন্ড জেলার সদর শহরের একমাত্র সরকারী বিদ্যালয় জগবন্ধু বিদ্যামন্দির-এ শিক্ষক। এর আগে অন্যান্য সরকারী বিদ্যালয় ঘুরে বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে আছেন গত সাত বছর ধরে। আ ছ'মাস পরেই তিনি অবসর নেবেন, এই বিদ্যালয় থেকেই। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আটত্রিশ বছর আ সরকারী বিদ্যালয় থেকে। থাকতেন বসিরহাটে একটি ভাড়া বাড়ীতে স্ত্রী নির্মলা ও পুত্র বাবাইকে (ভাল না অনির্বাণ) নিয়ে। মাঝখানে কয়েক বছর উত্তবঙ্গের জলপাইগুড়ি সরকারী বিদ্যালয়ে ছিলেন। তাঁর অ শেখানোর পদ্ধতিটিও ছিল চমৎকার। অনেক জটিল অঙ্কও তিনি সহজ করে বোঝাতে পারেন। এই কার ছাত্ররা তাঁকে আড়ালে "অঙ্কের খনি" বলে ডাকে। প্রচ্ছন্ন একটা গর্বও অনুভব করেন তিনি। জলপাইগুড়ি থাকার সময়ে তিনি টিউশনীও করতেন প্রচুর। টিউশন করার ইচ্ছা না থাকলেও কিছুটা আর্থিক প্রয়োজ এবং কিছুটা ছাত্রদের চাপে টিউশনী শুরু করেছিলেন। তারপর তাঁর পড়ানোর সুনাম ছড়িয়ে পড়তেই নিজে স্কুল ছাড়াও শহরের অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররাও তাঁর কাছে পড়তে আসতো। সেই কয়েক বছর একটা ঘোরে মধ্যে কেটে গেছে তাঁর। ভাল ভাল ছাত্রও আসতো পড়তে তাঁর কাছে। তাদেরকে পড়িয়ে আনন্দও পেয়েছে তিনি। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল একটি বিশেষ ঘটনার কথা। নবম ও দশম শ্রে ছাত্ররা মিলে দশ-বারোজনের একটি ব্যাচ ছিল তাঁর। ঐ ব্যাচে সকালেই মোটামুটি ভাল ছাত্র হ একজনের কথা তাঁর বিশেষভাবে মনে আছে। ছাত্রটির নাম ছিল তারাপদ। ডাক নাম ভোলা। ভালনা থেকেই ডাকনামেই সে পরিচিত ছিল বেশি। স্কুলের শিক্ষকও অনেকেই তাকে ডাকনামেই ডাকত। হরিপ মনে পড়লো একটি বিশেষ দিনের কথা। সেদিন তিনি ঐ ব্যাচের ছাত্রদের সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক সমাধান ক কায়দা-কানুন শেখাচ্ছিলেন। একটি কঠিন অঙ্ক তিনি সমাধানের কৌশল শেখাচ্ছিলেন। বারকয়েক শেখা পর বাকী সকলেই রপ্ত করতে পারলেও তারাপদ তখন ঠিক শিখতে পারেনি। সে ঝিন্‌মিনে গলায় বল

"স্যার আর একবার একটু দেখিয়ে দেবেন।" হঠাৎ বিরক্ত হলেন হরিপদ স্যার, কিন্তু মুখে কিছু না বলে 'দেখ হতভাগা" বলে আর একবার বুঝিয়ে দিলেন ভোলাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভোলা আবার বলে উঠলো "স্যার, এখনো ঠিক বুঝলাম না, আর একবার বুঝিয়ে দেবেন স্যার।" হরিপদ স্যারের বিরক্ত তখন ক্রোধে পরিণত হয়েছে। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে স্যারের। অন্যান্য ছেলেরা স্যারের এইরকম চেহারা দেখে কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে উঠল। কিন্তু তারাপদ ওরফে ভোলাকে কেবলমাত্র নির্বিকার। হরিপদ স্যার চোখ রক্তবর্ণ করে ভোলাকে সজোড়ে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে বললেন "যা হতভাগা তোকে আর অঙ্ক শিখতে হবে না। বেটা চাষীর ছেলে, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে লাঙল ঠেলগে। পড়াশুনা তোর দ্বারা হবে না। বাকী ছাত্ররা এই দৃশ্য দেখে ভয়ে সেঁটিয়ে রইল। কিন্তু ঠিলাটা বোধহয় একটা জোড়েই হয়ে গিয়েছিল। ভোলা ছিটকে গিয়ে বারান্দায় গিয়ে পড়লো। বারান্দার রেলিং-এ ধাক্কা লেগে মাথায় একটা কেটে গিয়েছিল। সেখান থেকে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। ভোলা একহাতে রক্তমাখা জায়গা ধরে আবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খাতাখানা স্যারের দিকে বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বললো "স্যার, আর একবার অঙ্কটা দেখিয়ে দেবেন। এবার আর ভুল হবে না। স্যা, ঠিক করতে পারব।" হরিপদ স্যার খাতাখানা রেখে বললেন "খুব লেগেছে না রে ভোলা। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারিনি রে। কিছু মনে করিস না রে। চল দেখি কতটা কেটেছে তোর।" বলেই হাঁক পাড়লেন "নির্মলা তাড়াতাড়ি একটু গরম জল, তুলো আর ডেটলটা নিয়ে এসো তো।" নির্মলা একটু পরেই ওগুলো নিয়ে এসে বললো, "কেনো কার আবার কী হল? তারপর ভোলার রক্তমাখা চেহারা দেখে বললেন, কীরে তোর এই অবস্থা কী করে হলো? কোথা থেকে পড়লি?" ভোলা কিন্তু স্যারের ধাক্কা দেওয়ার কথা না বলে ধীরে ধীরে বললো "বারান্দায় হঠাৎ স্লিপ করে পড়ে গিয়ে মাথায় লাগলো। ও কিছুনা, ভাল হয়ে যাবে।" হরিপদ স্যার তাড়াতাড়ি ভোলার মাথায় কাটা জায়গাটা ভাল করে গরম জল দিয়ে ধুয়ে ডেটল লাগিয়ে ছোটোখাটো একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে বললেন, "যা ভোলা, আজ বাড়ী যা, পরের দিন অঙ্কটা তোকে আর একবার বুঝিয়ে দেবো। মনটা খুব খারাপ লাগছে রে। আজ আর পড়াবো না রে, যা, সবাই বাড়ী চলে যা।" বলেই দুজন ছাত্রকে বললেন "এই তোরা ভোলার সঙ্গে গিয়ে ওর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আবার নিজেদের বাড়ী যাবি।" বলেই বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি।

স্নান করে খেয়েদেয়ে স্কুলে গেলেন হরিপদ। কিন্তু তাঁর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে সকাল থেকেই। স্কুলে পৌঁছে প্রথম পিরিয়ডের পর দশম শ্রেণীর একজন ছাত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে তোদের ক্লাসের তারাপদ মানে ভোলা আজ এসেছে? ছেলেটি বলল, হ্যাঁর স্যার — এসেছে তবে মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে। জিজ্ঞাসা করায় বলল বাড়ীতে পড়ে গিয়ে মাথায় লেগেছে।" হরিপদ বুঝলেন ভোলা আসল সত্যিটা বলেনি। টিফিনের সময় হরিপদ ভোলাকে ডেকে পাঠালেন। ভোলা এলে তিনি বললেন "কি রে খুব লেগেছে, না। ব্যথা করছে খুব কেন যে হঠাৎ আমি রেগে গেলাম বুঝতে পারলাম না। ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিস্। বলে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, যা, এবার ক্লাসে যা, আর এবার থেকে একটু মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। কেমন! জীবনে বড় হতে হবে তোকে। দেশের এবং সমাজের একজন উঁচু মানুষ হতে হবে। বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে।" "হ্যাঁ স্যার, আমি চেষ্টা করব।" খুব ধীর গলায় বলে আস্তে

আস্তে নিজের ক্লাসের দিকে এগোল ভোলা।

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। ভোলা ও হরিপদবাবু উভয়েই এই ঘটনার কথা ধীরে ধীরে ভুলে গেলেন। তবে হরিপদবাবু এরপর থেকে আর কোন ছাত্রেরই গায়ে হাত তুলতেন না। তবে একটা জিনিস তিনি লক্ষ্য করলেন যে ঐ ঘটনার পর থেকে ভোলা পড়াশুনায় আগের থেকে অনেক মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। এরপর কিছুদিন পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেল। মাধ্যমিকের ফল বেরনোর দিন সন্ধ্যে বেলায় ভোলা এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে হাজির হল হরিপদবাবুর বাড়ীতে। হেঁট হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বললো "স্যার আপনাদের আশীর্বাদে ভালভাবেই পাশ করেগিছি। আর অঙ্কেও ৬৫ নম্বর পেয়েছি স্যার।" "বাঃ, খুব ভাল। এবার উচ্চমাধ্যমিকে ভর্ত্তি হয়ে আর ভালভাবে পড়াশুনা করবি। কি নিয়ে পড়বি ঠিক করেছিস?" "বিজ্ঞান বিভাগেই পড়ব স্যার। আর অঙ্ককেও রাখব।" "বেশ, বেশ, খুব ভাল। কল্যাণ হোক তোর" বলে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন হরিপদ। ভোলা খুশী মনে চলে গেল।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বেড়নোর পর ভোলা একদিন এসে হাজির মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে। "ভালভাবে পাশ করে গেছি স্যার। আর অঙ্কেও ৮০ নম্বর পেয়েছি স্যার।" বলে প্রণাম করে ভোলা। তারপর বলল "এখানে আর থাকবো না স্যার, কলকাতায় কলেজে ভর্ত্তি হব আর দিদির বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করব।" "বাঃ, খুব ভাল, মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। আর জীবনে আরও বড় হবে, মানুষ হতে হবে তোকে।" "হ্যাঁ স্যার, চেষ্টা করব।" বলে ভোলা বিদায় নিল। হরিপদ মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সেই ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়ার পর থেকেই ভোলার এই পরিবর্তন হয়েছে তিনি লক্ষ্য করেছেন। পড়াশুনায় আগের থেকেও মনোযোগী হয়েছে। থাক, তাঁর একটা ধাক্কায় যদি ছেলেটি ভাল হয়ে থাকে তবে তিনি একটা ভাল কাজই করেছেন। মনে মনে হাসলেন তিনি।

এরপর কালের প্রবাহে অনেকদিন কেটে গেছে। ভোলার কথাও হরিপদবাবু একরকম ভুলে গেছেন নূতন নূতন ছাত্রদের আগমনের কারণে। সরকারী আদেশ অনুযায়ী তিনিও জলপাইগুড়ি সরকারী বিদ্যালয় থেকে বর্তমানে শ্রীখন্ডের জগবন্ধু সরকারী বিদ্যালয়ে এসেছেন। এই বিদ্যারয়ের নূতন পরিবেশে সঙ্গেও তিনি মানিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। এখানকার ছাত্ররাও পড়াশুনায় বেশ ভাল। এই বিদ্যালয়েই থাকা সময়ে একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ল তাঁর। বছর দু'য়েক আগের কথা। জেলা সদরের একমা সরকারী বিদ্যালয় হওয়ার কারণে প্রতি বছরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলাশাসকের সভাপতি অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় এবং কৃতী ছাত্রদের তিনি স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং পরিশেষে ছাত্রদে উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য ও পরামর্শ উপস্থাপন করেন। সেবার ও যথারীতি পূজার ছুটির আগে একটা দিন নির্দি দিনে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণে দিন ধার্য হয়েছে। টিচার্স কাউন্সিল এর সভায় প্র শিক্ষক মহাশয় তাঁকেই অনুরোধ করলেন বরিষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে মাননীয় জেলাশাসককে স্বাগত জানানো প্রাথমিক আপ্যায়ণের। তাঁর তত্ত্বাবধানে দুজন শিক্ষক এবং কয়েকজন ছাত্র পুষ্পস্তবক দিয়ে জেলাশাসক অভ্যর্থনা জানাবেন। হরিপদবাবু না করতে পারলেন না রাজী হয়ে গেলেন এই প্রস্তাবে। এবার আর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর সভা শেষ হল।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট দিনে শ্রীখণ্ডের সরকারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনটিকে ফুল ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। ছাত্ররা ও স্কুলের নির্দিষ্ট পোষক পরিধান করে সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা জেলাশাসককে বরণ করে নেবার জন্য। হরিপদবাবুও তাঁর সতীর্থ অন্য দুই শিক্ষক এবং কয়েজন ছাত্রকে নিয়ে সভাপতিকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত। হরিপদবাবু আজ অনেকদিন পর ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বাঙালী পোষাকে স্থলে এসেছেন। হাতে তাঁর একটি বিরাট পুষ্পস্তবক। কিছুক্ষণের মধ্যে সভাপতি তথা জেলাশাসককের গাড়ী স্কুলের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেহরক্ষী দরজা খুলে দিতেই ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নামলেন মাননীয় সভাপতি তথা জেলাশাসক। হরিপদবাবু তাঁর সতীর্থ ও ছাত্রদের নিয়ে খানিকটা দৌঁড়েই এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। "আসুন স্যার, আসুন। শ্রীখণ্ড জগবন্ধু বিদ্যালয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই।" বলে পুষ্প স্তবকটি জেলাশাসকের হাতে দিতে গেলেন। কিন্তু একি! সকলকে অবাক করে দিয়ে মাননীয় জেলাশাসক তখন সামনে গুড়ি হয়ে হরিপদবাবুর পায়ে হাত দিতে ব্যস্ত। হরিপদবাবু সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। "এ কি করছেন স্যার। আমি এই স্কুলের একজন শিক্ষক মাত্র। আপনাকে বরণ করে সভায় নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার।" জেলাশাসক কিন্তু মানলেন না। হরিপদবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সেই হাত মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, "আমাকে চিনতে পারলেন না স্যার। আমি কিন্তু অনেকদিন পর হলেও আপনাকে একঝলক দেখেই চিনতে পেরেছি।" হরিপদবাবু তখনও অবাক। আশেপাশে উপস্থিত সকল ছাত্র এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও তখন অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছে। "কিন্তু কে বাবা তুমি?" একবারে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলেন হরিপদবাবু। জেলাশাসক বললেন, "জলপাইগুড়ি সরকারী স্কুলের তারাপদ বা ভোলাকে আপনার মনে আছে স্যার।" একটু থমকে গিয়ে হরিপদবাবু অতীতের স্মৃতি হাতড়াতে লাগলেন। "আমিই সেই তারাপদ সেন যাকে আপনারা ভোলা নামেই ডাকতেন।" "কিন্তু তুমি এখানে এবং এই পদে কিভাবে এবং কবে এলে বাবা?" বললেন হরিপদবাবু। "স্যার, আপনি পড়াতে পড়াতে একদিন আমাকে যে ধাক্কাটা দিয়েছিলেন, সেই ধাক্কাটাই আজ আমাকে এইখানে এনে ফেলেছে স্যার। তা না হলে হয়তো কোথাও তলিয়ে যেতে পারতাম।" এবার অনেকটা ধাতস্থ হয়ে হরিপদবাবু বললেন, "বাঃ বেশ বেশ। আমি তো তোমাকে চিনতেই পারিনি আর সত্যি, কথা বলতে কি তোমার কথার আমার মনে ছিল না। জলপাইগুড়ি থেকে এইচ. এস. পাশ করে তো তুমি কলকাতার চলে গিয়েছিলে উচ্চশিক্ষার জন্য। তারপর এই এখন তোমার সঙ্গে দেখা। আরো বড় হও এবং মানুষের মত মানুষ হও বাবা।" তারপর বললেন, "চলো এখন অনুষ্ঠান মঞ্চে। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অনুষ্ঠান আরম্ভের তোমার অনুমতির জন্য।" বলে জেলাশাসককে সঙ্গে করে নিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চে এসে সভাপতির নির্দিষ্ট স্থানে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ও ছাত্ররাও অত্যন্ত সমীহের চোখে হরিপদ স্যারকে দেখতে লাগলো। স্তোত্র পাঠের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। এরপর স্কুলের ছাত্ররা গান, আবৃতি এবং ছোট কৌতুক নাটক পরিবেশন করল। তারপর স্কুলের কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণে পালা হল। সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে মাননীয় জেলাশাসক সকলকে ধন্যবাদ জানালেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করার কথা বললেন। পরিশেষে তিনি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক হরিপদবাবু সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

করলেন। উপস্থিত সকলের সামনে তিনি সেই পুরানো দিনের ঘটনাটি নিজেই উল্লেখ করে বললেন, "স্যা
যদি সেদিন ঐ ধাক্কাটা আমায় না দিতেন, তবে আমি হয়তো কোথায় তলিয়ে যেতাম। এই মধ্যে আমা
যোগ্যতা হয়তো থাকতো না।" বলেই হরিপদবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্যার এখনো এরকম ধা
কাউকে কাউকে দেন তো? কারণ কিছু ছাত্রের পক্ষে এই ধাক্কা খুবই দরকার।" হরিপদবাবু মুখে কোন উত্ত
না দিয়ে একটু স্মিত হাসলেন। পরিশেষে বিদায় নেওয়ার আগে জেলাশাসক হরিপদবাবুকে সস্ত্রী হ
একদিন জেলাশাসকের বাংলোয় আসার জন্য নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ করলেন।

শুরুর আগে একটি বিশেষ সম্বর্ধনা মিটিং এর কথা বলেছিলাম যার জন্য হরিপদবাবুর মনটা
গতরাত্র থেকেই চঞ্চল হয়ে আছে। এবার সেই সম্বর্ধনার কথায় আসি। দিন কয়েক আগে নবম শ্রেণীর এ
ছাত্রকে অনেকদিন পর রাগ সামলাতে না পেরে একটি চড় মেরেছিলেন কারণ তিনি বোর্ডে অঙ্ক বোঝানো
সময় ছেলেটি অঙ্ক না শিখে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছিল এবং অন্যান্য ছাত্রদের বিরক্ত করছিল। ঐ ঘটনা
প্রতিবাদে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্ররা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও অন্যান
সদস্যরা দুপুর বারোটায় স্কুলের মিটিং রুমে সভা ডেকেছেন তাঁর বিচার করার জন্য। আর সেই কারণে
গতরাম থেকে তাঁর মনটা চঞ্চল ও অস্থির হয়ে আছে। বিচার এক রকম আগের থেকেই হয়েছিল। সভা
তার আনুষ্ঠানিক ঘোষনা হল মাত্র। প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের ম
হরিপদবাবু দীর্ঘদিনের বরিষ্ঠ শিক্ষক এবং কৃতী শিক্ষক হলেও গায়ে হাত দেওয়াটা তাঁর উচিত হয়নি। কার
বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের গায়ে হাত তোলাটা অপরাধের সামিল। যাই হোক, হরিপদবাবু কিছু বলার থাক
বলতে পারেন। গভীর দুঃখ হতাশা ও অপমানে হরিপদ জানালেন যে তাঁর কিছু বলার নেই। সভার নির্দেশ
তিনি মেনে চলবেন। সভায় ঠিক হল যেহেতু আর দু'মাস পরেই হরিপদবাবুর অবসর। কাজেই অন্য কো
শাস্তি তাঁকে দেওয়া হল। তবে নবম শ্রেণীর ঐ ছাত্রটির কাছে তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। আর এক
টোকেন শাস্তি বাবদ ম্যানেজিং কমিটির তহবিলে তাঁকে দু'হাজার টাকা জরিমানা হিসাবে দিতে হবে। অ
ভবিষ্যতে তিনি যেন এরকম ঘটনা আর না ঘটান। হরিপদবাবু চুপচাপ সবকিছু শুনলেন এবং ঘাড় নেড়ে তাঁ
সম্মতি জানালেন। সভা শেষে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্ররা জয়ধ্বনি দিতে দিতে ক্লাসের দিতে রওনা হ
স্কুল ছুটির শেষে হরিপদবাবু ও বাড়ী ফিরে এলেন।

পরদিন বিদ্যালয়ে খবর পাওয়া গেল হরিপদবাবু স্কুলের করণিক নিমাই দাসের মারফৎ এক
মুখবন্ধ খামে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। শুধু তাই নয়, স্ত্রীকে স
নিয়ে এই তল্লাট ছেড়ে তিনি পাড়ি দিয়েছেন কলকাতায় তাঁর ছেলেন কাছে। বলে গিয়েছেন বাকী জীবন
তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছেলের কাছেই কাটাবেন। একটা জোড় ধাক্কা তিনি দিয়ে গেলেন এই সমাজকে।

দেশ ভ্রমণ একটি শিক্ষা এবং দেশকে জানা

— মোহাঃ এক্রামুল হক
বি.এ. ১ম বর্ষ, রোল নং ১২৯২

এই বিশ্বকে দুচোখ ভরে দেখার আর এক নাম ভ্রমণ। বিপুল এই বিশ্বে কত দিকে ছড়িয়ে আছে কত শহর, নগর। মানব জগতের অভিনব বিভিন্ন ধরণের কৃতিত্ব, কীর্তি। আমরা আমাদের চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে সব কিছু দেখতে চাই। অজানাকে জানা, অচেনা কে চেনা, না দেখা জিনিস গুলিকে দেখার জন্য ভীষণ ভাবে আকুল হয়ে পরি। সেই কারণেই মানব সমাজ দেশ থেকে দেশান্তরে নগরে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে ভ্রমণ করে থাকি। এক ঘেয়েমি বদ্ধ ও ক্লান্তিকর জীবন থেকে মুক্তির বাতাস পেতেই প্রয়োজন হয় দেশ ভ্রমণের।

সুদূর অতীতকাল থেকেই চলে জ্ঞানের অন্বেষণে, দেশ বা পৃথিবীকে নবরূপে জানার নেশায় মানুষ ভ্রমণ করে বিভিন্ন দেশ-দেশান্তরে। অতীতে বিজ্ঞান সভ্যতার তেমন কিছু বিকাশ ঘটেনি। পথ-ঘাট ছিল দুর্গম, যানবাহনের ব্যবস্থা ভালো ছিল না, তবুও মানুষ শারীরিক কষ্ঠ করেও দেশ-বিদেশ পাড়ি দিত। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার অদম্য আকর্ষণে মানুষ তাই উপেক্ষা করেছে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে শুধুমাত্র নির্জন প্রকৃতির স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে থাকার একান্ত বাসনায় মানুষ পা ফেলেছে হিমালয়ের পাদদেশে, সাহারা মরুভূমি, আরব সাগরের সৈকতে, দীঘার সমুদ্রের সৈকতে। সুদূর অতীতে পর্যটক হিসেবে এদেশের বুকে এসেছেন হিউ-য়েন-সাঙ, ফা-হি-য়েন, মেগাস্থিনিস প্রমুখ। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ছিল এক দূরন্ত অভিযান। ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হয়ে ছিলেন ঔপনিবেশিক মানসিকতায়।

আমাদের কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই উচ্চতর স্থানে পৌছে দেয় না। জ্ঞান বিকাশের অন্যতম পথ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। দেশ ভ্রমণের মধ্যদিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি ঐতিহাসিক নানা স্থান ও দর্শনীয় বিষয়, ভৌগলিক মানচিত্রের নানা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে আরও আমরা দেখতে পাই সমাজ জীবনে কত না বিচিত্র রূপ ও ছবি। দেশ ভ্রমণের মাধ্যমেই অতীতের ইতিহাসের খবরা-খবর জীবন্ত রূপ ধারণ করে। বর্তমান কালের সঙ্গে অতীতের মেলবন্ধন রচিত হয়। আমরা পাঠরত গ্রন্থের নিস্প্রাণ ছবি গুলোকে জীবন্ত রূপে অনুভব করতে পারি।

মানব জীবন মহৎ একটি শিক্ষার অঙ্গ তবুও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দেশ ভ্রমণ মানে

শুধুমাত্র ইতিহাসের উপাদান আর ভৌগলিক দিক থেকে মানচিত্রের ছবিগুলোকে দেখা নয়, দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা সভ্যতা, সংস্কৃতির ও জীবনচর্চার একটা বাস্তবরূপকে অনুধাবন করতে পারি। বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণার জন্ম হয়। দেশ ভ্রমণ আসলে পরিচিত গন্ডির বাইরে অপরিচিত জগতের পরিচিত হওয়ার একটা বিশাল ছাড়পত্র দেয়। তাই যাবতীয় জড়তা, সংকীর্ণতা, সংকোচ ও দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নতুনএক জগৎ-এর সন্ধান পাওয়া যায়। দেশ দেশান্তরের ভ্রমণের মধ্য দিয়ে দুটি ভিন্ন দেশের নাগরিকবৃন্দের ভাব বিনিময় ও ভালোবাসার বিনিময় হয়ে থাকে। আমাদের মনের গভীরে যে চেতনা নবতর বৈচিত্র্য আস্বাদনের মাধে দেশ ভ্রমণ এনে দেয় জীবনের দিশা। তাইতো দেশ ভ্রমণ শিক্ষা ও চেতনার প্রকৃত অঙ্গ।

সংস্কৃত বিভাগীয় আলোচনা সভায় ছাত্রীদের সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন

এক যাত্রা পথে

হাসিনা খাতুন
শ্রেণি - বাংলা অনার্স (সেমেস্টার-১)

বোলপুর স্টেশনে নেমেই রিক্সা নিলাম। অনেকটা পথ যেতে হবে, তাই হাসিমুখ রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। বেশ রসিক মানুষ 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে' উদার কণ্ঠে আবৃত্তি করছে আর পাও খুব জোরে চালাচ্ছে। তার আবৃত্তিকে ছাপিয়ে বৃষ্টি ঝমঝম শব্দে মুষলধরে নেমে এল। কি আর করা যায় রাস্তার ধারের একটা ভাঙা গোয়ালঘরে গিয়ে সোজা উঠলাম। সেই রিক্সাওয়ালার নাম ছিল শ্যামসুন্দর। চুপ করে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না, এদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নেই। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপের পর আমি শ্যামসুন্দর কাকুকে বললাম তার জীবনের একটা গল্প বলতে।

"কী আর বলব সোনা! মেঘে ঢাকা জীবন তবুও মাঝে মাঝে কিছুটা রোদের ঝিলিক দেখা যায়।" বাবা অকালেই চোখ বুঝলেন। এই বলে একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শ্যামকাকু করুন নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল — আমি তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। মা মামার বাড়িতে এসে উঠলেন। Widow Pension -র একশোটা টাকায় মাত্র সম্বল। এখনকার মতো তো বিনা বেতনে পড়বার ব্যবস্থা সরকার করেননি। তাই পুরো বেতন দিয়েই বোলপুর হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। মামাতো দাদার মাস্টারমশাই পড়াতে আসতেন। তিনি খুব সুন্দর ভাবে উদাহরণ সহকারে পড়া বোঝাতেন। আমি বারান্দায় বসে তা যত্ন করে লিখে নিতাম। স্কুলে ফাইনালে জেলাবৃত্তি পেলাম। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের পর আর পড়াশোনা চালানো সম্ভব হল না নানা কারণে।

আমার স্কলারশিপের টাকা থেকে মা কিছু লুকিয়ে জমিয়ে রেখেছিলেন আমার অগোচরে। সেই টাকায় আমি নিজের একটা রিক্সা কিনেছি। এই রিক্সা আমার কাছে লক্ষ্মী স্বরূপা। আমাদের শাস্ত্রের রাজর্ষি জনক এবং বলরাম নিজের হাতে হলকর্ষণ করেছেন। একথা স্মরণ করেই আমি যেকোন শারীরিক পরিশ্রমকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখেছি। একদিন কি হল জান? শেষ ট্রেনের প্যাসেঞ্জার বাবুকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখি একটা বাক্স রিক্সার এক কোণে পড়ে আছে। মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, গয়নাগাটির বাক্স হতে পারে। এখনি যেন দিয়ে আসি। "বাঁচান বাঁচি মারেন মরি ধন্য হরি ধন্য হরি" স্মরণ করে বেরিয়েতো পড়লাম, হঠাৎ আকাশ ঝেপে বৃষ্টি এল। বাবুদের বাড়িতে কড়া নাড়ার শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে বৃষ্টির শব্দ, বাক্সটা ফিরে পেয়ে বাবুর বিস্ময়ে ও আনন্দে মাখামাখি তাঁর সেই মুখটা আমি আজও স্পষ্ট মনে করতে পারছি। মা-ঠাকুরন এসে একটা বড়ো নোট হাতে জোড় করে গুঁজে দিলেন। বাড়ি ফিরছি আর সেই সময়

বাইরের দরজা টায়ারখানা গেল। রিকশাটা টেনে আনতে আনতে রাত বারোটায় বাড়ি এসে পৌঁছলাম। বাইরের দরজা হ্যারিকেনটা জ্বেলে মা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত কান্না ছাপিয়ে জগতের বুকে একটা আনন্দের সুর অবির যে বয়ে চলেছে, তা বুঝতে পারলাম।

কিন্তু মানুষের সব দিন তা সমান যায় না, একটি মাত্র মেয়ে, তাই ভালো ঘরে বিয়ে দেবার আপ্র চেষ্টা করেছিলাম পাত্রও ভালো পেলাম এবং পণের টাকা মেটাতে গিয়ে প্রচুর ধার বাকিও হল। ভ ভাবলাম, থাক মেয়েটাতো আমার সুখে থাকবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমার মেয়ের হার্টে ফুটো ধরা পড় পাত্রের বাড়ির লোকজন মেয়েটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল — চিকিৎসার ভার তারা নিতে পারবেন ভাবলাম ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। মেয়েকে বললাম দরকার নেই তোর ওরকম শ্ব বাড়িতে ফিরে যাবার। আমরা বাপ-বেটিতে মিলে থাকব। কিন্তু, হঠাৎ একদিন বিকেল বেলা খবর পেলাম আমার মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে। বুকে কে যেন বজ্রাঘাত করল। গিয়ে দিখে — পদ্মফুলের ম কমনীয় মুখের প্রতিটি রেখায় দুর্বিষহ যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

যখনই আমি 'The Struggle Against Dowry' গল্পটিতে 'These days howev the numbers of snehalatas are - gradually inereasing.' লাইনটি পড়ি তখনই আম শ্যামসুন্দর কাকুর সেই করুণ মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। কিন্তু বাস্তবে যে এমন ঘটন শুনতে হবে তা ভাবতে পারিনি। আচ্ছা, শ্যামসুন্দর কাকুর মেয়ের এরকম পরিণতির জন্য প্রকৃত দায়ী ে — শ্যামসুন্দর কাকুর উচ্চাকাঙ্খা........., না তার মেয়ের বাস্তবকে মেনে না নেওয়ার ক্ষমতা........., সমাজে ঘুন ধরা পণপ্রথা........, না আমাদের জঘন্য পাশবিক মানবিকতা? শ্যামসুন্দর কাকুর কান্না বিরহী বাতাস আর ভারী করে তুলল।

কলেজের ফুটবল টীম

'দিশারী' : প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত পরিচালনসমিতির সভাপতি শ্রী বিপ্লব ওঝা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী দেবব্রত সাহা, অধ্যাপক ডঃ বংশীধর সাহু, অধ্যাপক নীলমণি মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক সুখেন কুমার মন্ডলের তত্ত্বাবধান NSS বিভাগের ছাত্ররা পোধরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পরিবেশ পরিষ্কারে নিযুক্ত

'সুহৃদ-সমাবেশ': প্রাক্তন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী কৃত্তিমান বিশ্বাস, ভূতপূর্ব ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী দেবব্রত সাহা, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ গৌতম সেন এবং অধ্যাপক ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী

NCC- র দায়িত্ব পালনে
মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা

হীরালাল ভকত কলেজের
অধ্যাপক মন্ডলী ও শিক্ষার্থী বৃন্দ

দর্শকমন্ডলী শারদোৎসব ২০১৮

জাতীয় পতাকা হাতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
শ্রী দেবব্রত সাহা মহাশয়

চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের দায়িত্বে অধ্যাপক স্বপন সাহা ও বংশীধর সাহু ও শিক্ষাকর্মী পিন্টু কুমার মন্ডল

জাতীয় সেবা প্রকল্প আয়োজিত ৭ দিন ব্যাপি বিশেষ শিবিরের কর্মশালায় উপস্থিত উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীগণ

স্বচ্ছতা সমারোহ ঃ হীরালাল ভকত কলেজ NCC বিভাগ

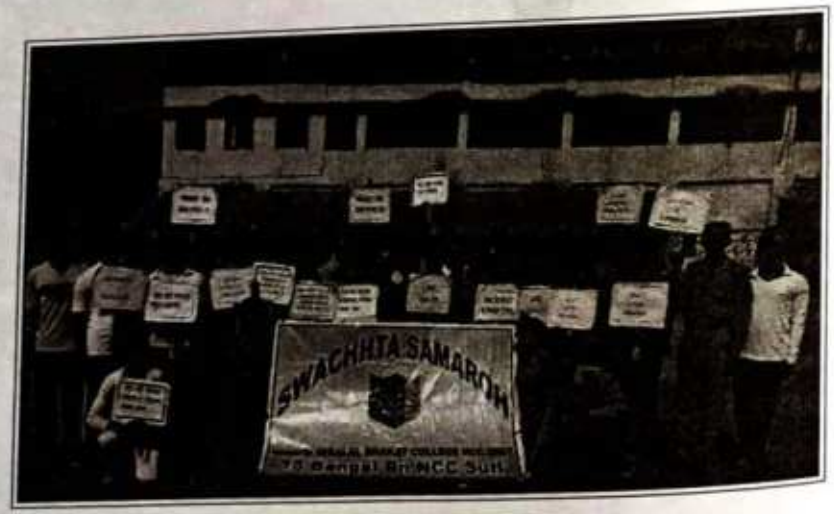

।। নারী সুরক্ষা ঃ কিছু ভাবনা ।।

– ড. চৈতন্য বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ যতই ঘটুক, আমরা এখনো স্বীকার করতে বাধ্য হব, নারীর সুরক্ষার ব্যবস্থা আমরা আজও করতে পারিনি। সভ্য মানুষদেরই একটা অংশ আজও তাদের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা পশুগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। নারীকে, সে পাঁচ বছরের শিশুই হোক, বা পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধা, অরক্ষিত দেখলেই সেই সব পুরুষ মানুষ গুলোর মনের খোয়াড়ে আটকে থাকা হিংস্র পশু গুলো জেগে ওঠে এবং খোয়াড়ের বেড়া ভেঙে অসহায় নারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারীর সর্বনাশ তো হয়ই; সেই পাশবিক প্রবৃত্তির পুরুষটিরও তো সর্বনাশ হয়। প্রথমত, ধরা পড়লে গণধোলাই যদি নাও হয়, হাজতে বা জেলে কিছুদিন কাটাবার ব্যবস্থাতো হতেই পারে! দ্বিতীয়ত, ঐ পুরুষটিকে 'মানুষ' বলে আর কেউ বিশ্বাস করে না, ঘৃণার চোখে দেখে। যদি তার মনুষ্যত্ব জেগেও ওঠে, তবে বিবেক দংশন আর অনুশোচনায় তাকে সারা জীবন কুরেকুরে খাবে; একি কম যন্ত্রণার হবে! তৃতীয়ত, ঐ পুরুষটির বাবা, মা, আপনজনেরাও তো সমাজে আর মাথা উঁচু করে চলতে পারবে না। কিছুটা হীনমন্যতায় তাদেরওতো ভুগতেই হবে। টাকার জোরে, প্রতিপত্তির জোরে, প্রতাপের জোরে এমন পুরুষদের কেউ কেউ আড়ালে থাকতেই পারে, কিন্তু সে তো ধুলো দিয়ে 'বিষ্ঠা' ঢেকে রাখার মতোই হয়! ধুলোর আড়াল দিলেই বিষ্ঠাতা আর গোময় হতে পরে না।

শারীরিক শক্তির বিচারে, গড় হিসেবে, পুরুষের তুলনায় নারী দুর্বল। নারী নিজের শক্তিকে ভরসা করে পশু ভাবাপন্ন পুরুষের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, এমনটা আশা করা যায় না; তবুও কিছু মেয়েতো এখন নানা রকম অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের শারীরিক শক্তি বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে; আত্মরক্ষার নানাবিধ কৌশল আয়ত্ত করছে। কুংফু-ক্যারাটের প্যাঁচে কত দুষ্ট পুরুষকে ঘায়েল করে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করেছে এমন দৃষ্টান্তও এখন পাওয়া যাবে। তাই, এই শারীরিক কলাকৌশল এবং 'ফিটনেস' আয়ত্ত করার অনুশীলনে আজকের মেয়েদের উৎসাহিত হ'তে হবে।

মেয়েরা সেই আদিম যুগ থেকেই শক্তিশালী, নির্মম, কামুক পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আসছে। যখন সমাজ সেভাবে গড়ে ওঠেনি, বিবাহ প্রথা চালু হয়নি, তখন মেয়েদের রক্ষা করবার প্রবৃত্তিও কারো ছিল না। তাই, মাঝে মাঝে যন্ত্রণা পাওয়াটাই তাদের জীবনে স্বাভাবিক ছিল। মানুষ যত সভ্য হয়েছে, সুখে থাকবার উপায়ও তারা উদ্ভাবন করেছে। তারা সমাজ গঠন করেছে; বিবাহ প্রথা চালু করেছে; পরিবার চালু করেছে; উপার্জন, সঞ্চয় ও বিনিময় প্রথা চালু করেছে। ব্যবস্থা করেছে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবার আরও কত রকম বস্তর। সভ্যতার যত উন্নতি হয়েছে, ব্যবস্থারও ততই সমৃদ্ধি হয়েছে। নারী সুরক্ষার জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা, নতুন নতুন আইন তৈরি হয়েছে। তা'সত্ত্বেও মেয়েরা যে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত নয়, তা তো খবরের

কাগজের পাতা খুললেই বুঝতে পারি।

দেশের সুশাসন যখন নষ্ট হয়, কিম্বা পরজাতি বিজয়ী হয়ে শাসন ক্ষমতা দখল করে, কিম্বা অযোগ্য লোক শাসক হয়ে বসে; দুরাচারী, অনাচারী, পাপীষ্ঠরা শাসককে পরিচালিত করে, তখন নারী সরক্ষায়ই অবনতি ঘটে। সমাজের বৌ-ঝিরাই সংকটাপন্ন হয়। মধ্যযুগে তুর্কি বিজয়ের পর এই রকম সংকটের কালে অসহায় মানুষ পরিবার ও সমাজের মেয়েদের রক্ষা করার জন্য অন্তঃপুরে আটকে রাখাটাই উচিত বলে মনে করে। অভিজাত ও সম্পন্ন ঘরের মেয়েরা তো সেই থেকে অন্তঃপুর বাসিনী হয়ে যায়। নিতান্তই যাদের বাইরে বের হতে হ'ত, তারা পালকি এবং রক্ষী নিয়ে বের হত। যাদের তা'জুটত না তারা ঘোমটা দিয়ে পরিচি পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে বের হ'ত। এখনো পর্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে অনেক বৌ-মেয়েরা পুরুষ সঙ্গী ছাড়া পথে বের হ না। তবে, এই প্রথা আজ মেনে চলা সম্ভব নয়। আজকের মেয়েরা সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিযোগিনী হয়ে উঠেছে। সভ্যতা নারীর অধিকারকে প্রসারিত করে দিয়েছে। বৃহত্তর সংসারে ডানা মেলবার, জীবনকে উপভোগ করবার অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দেরা যে নারী শিক্ষা সূচনা করেছিলেন, সেই নারী শিক্ষার সুযোগ আজ দেশের নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও পাচ্ছে। পাচ্ছে যখন, তখন শিখবে না কেন?

শিক্ষাই আজ অন্তঃপুর থেকে মেয়েদের বাইরে টেনে এনেছে। যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে। প্রতিভা মেধার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাবার সুযোগ ক'রে দিয়েছে। আজকের মেয়েরা নিঃসংকোচে স্কুলে যাচ্ছে, কলে যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, হস্টেলে থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ক'রে শিক্ষিকা হচ্ছে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয় হচ্ছে, যেকোনো ধরণের চাকরি করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে, পুলিশের চাকরিও করছে কত মেয়ে! গত প দশকে মেয়েদের চিন্তা-ভাবনার এবং পোশাকের কত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে কাজের এ আচরণের। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা পুরুষদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে, তারা কোনও দিক থে পুরুষের কম নয়। তারা মহাকাশ যাত্রায় সক্ষম, মন্ত্রী হয়ে দেশ চালাতেও সক্ষম। দেশের আইন তাদের সুযোগ দিয়েছে। তবুও নারীকে সুরক্ষার কথাটা ভাবতেই হয়। এখানেই তারা পুরুষের থেকে পিছিয়ে একজন যুবাপুরুষ যেকোনো সময়ে, যেকোনো স্থানে, যতটা সহজে একা চলাফেরা করতে পারে, একা যুবতীনারী এখনো যে সেটা পারে না, তা' বলাই বাহুল্য। আইনের যত ক্ষমতাই থাক, সেতো পশুকে মা করে তুলতে পারে না!

মানুষের মধ্যে বসবাসকারী হিংস্র পশুর সম্পর্কে মানুষ সচেতন থাকতে পারে না। অনুকূল পরি বা সুযোগ পেলেই সেই পশু দাঁত, নখ বের করে, স্বরূপ ধারণ করে অসহায় শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে প একজন তথাকথিত মান্যগণ্য ভদ্রলোকও সুযোগ পেলে এমন ভয়ংকর পশুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। ও যখন তা' হয়, তখন আইনের কথা, সম্পর্কের কথা, পরিণতির কথা — কিছুই তার ভাবনার মধ্যে থাকে তাই, শ্বশুর বৌমাকে, এমনকি বাবা মেয়েকে রেয়াত করে না। এমন ঘটনাতো খবরের কাগজের দৌলতে

আমরা জানতে পারি।

কোন্ মানুষটা কখন মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশু হয়ে উঠবে, সঙ্গী চেনা মানুষটা যে কখনো পশু হয়ে উঠবে না, তা নিশ্চিত ক'রে কে বলতে পারে? তাই, সব পুরুষের ব্যাপারেই মেয়েদের সাবধান ও সতর্ক থাকতে হয়। এতে মেয়েরাও সুরক্ষিত থাকে, পুরুষেরাও। কারণ, কোনো এক মুহূর্তে, কোনো এক দ্রব্য গুণে' বা কোনো মায়ায় যে পুরুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশু হয়ে যায়, সর্বনাশতো তারও কম হয় না! এযুগে ধর্ষিত, লাঞ্ছিত, অসুস্থ, নিরপরাধ মেয়েদের দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেবার লোকের অভাব নেই। মনের দাগটা হয়তো মোছে না, কিন্তু ব্যথা ঘুচে যায়। অন্যদিকে, যে পুরুষটির বা পুরুষগুলোর পশুত্বের কারণে মেয়েরা অত্যাচারিত হয়, সে ধরা পড়ে গেলে গণধোলাই, পুলিশিধোলাই, হাজতবাস, কারাবাস — এসবতো আছেই, তার সঙ্গে নানা রকম বিড়ম্বনা, অর্থনাশ, সামাজিক মর্যাদাহানি, পরিচিত জনের ঘৃণা — এসবও থাকে। ধরা না পড়লেও বিবেক দংশন, অনুশোচনা, পালিয়ে বেড়ানোর যন্ত্রণাটাও তো কম হয়! তাই, মেয়েরা সুরক্ষিত থাকলে সুরক্ষিত থাকে পুরুষরাও। একথা মানতেই হবে, বিশেষ মুহূর্তে যে পুরুষরা হঠাৎই পশু হয়ে যায়, তারা একশো ভাগ পশু নয়। তারাও বেশির ভাগটাই মানুষ। পরিস্থিতির প্রভাবে পশু হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রে এমন সংবাদতো আমরা কতই পড়ি — 'শিক্ষক নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার', 'অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ', 'প্রতিবেশী কন্যাকে ধর্ষণ করে খুন', 'ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে গ্রেফতার প্রতিবেশী বৃদ্ধ', 'মাসতুতো বোনকে ধর্ষণ করে পলাতক গুণধর দাদা' — এই রকম সংবাদ আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। এইসব শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রতিবেশী দাদা, বন্ধু — এরা হয়তো ভালো মানুষই। হয়তো এদের দ্বারা অনেকের উপকার হয়েছে। তবু, বিশেষ পরিস্থিতিতে মুহূর্তের ভুলে একটা মেয়ের সর্বনাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের, নিজের পরিবারের, আত্মীয়-স্বজনদের — অনেকের সর্বনাশ সাধন ক'রে ফেলে।

তাই, নারী সুরক্ষা শুধু নারীরই সুরক্ষা নয়, পুরুষের সুরক্ষা, পরিবারের সুরক্ষা, সমাজের সুরক্ষা। সমাজকে সুস্থ রাখার জন্যই আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে, আমরা এমন পরিস্থিতি তৈরি করব না, কাউকে করতে দেব না, যাতে আমাদের মনুষ্যত্ব পশুর কাছে হার মানে; মানুষ থেকে আমরা পশু হয়ে যাই। এজন্য ছেলেদের, মেয়েদের, অভিভাবকদের সতর্ক থাকতেই হবে। অপরিচিত, কম পরিচিত বা পরিচিত যুবক পুরুষদের সঙ্গে বালিকা, কিশোরী বা যুবতীদের নির্জনে সাক্ষাৎ করা, পুরুষের পশু-প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে এমন পোশাক পরা; অকারণে বা তুচ্ছ কারণে অসময়ে বাড়ির বাইরে কাটানো, অপরিচিত বা কম পরিচিত যুবককে বন্ধু হিসেবে বেশি পাত্তা দেওয়া অবশ্যই বিপজ্জনক। এ ব্যাপারে মেয়েদেরই বেশি সতর্ক থাকা উচিত। যাদের কোনো কারণে রাত-বিরেতেও একা চলতে হয়; পথের পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে, তাদের আত্মরক্ষার জন্য কিছু শারীরিক কৌশল আয়ত্ত করতেই হবে। তার অনুকূল পোশাকও পরতে হবে। ক্যারাটেতে দক্ষ একটা মেয়ে অনায়াসে দু-পাঁচটা লম্পট পশুকে ঘায়েল করে দিতে পারে।

আজকের শিক্ষিত যুবতী মেয়েরা, যারা কাজের সূত্রে বাইরে যেতে বাধ্য হয়, ট্রেনে-বাসে পুরুষদের গা ঘেঁষে চলতে বাধ্য হয়, তাদেরতো কুংফু-ক্যারাটের মতো কিছু শিক্ষা নিতেই হয়। নারী সুরক্ষার জন্য নারীকে তৎপর হতেই হবে।

নারী সুরক্ষা বলতে শুধু নারীর ইজ্জৎ বাঁচানোকেই বোঝায় না, নারীর অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করাও নারী সুরক্ষা। ভারতীয় সংবিধান নারীরও কিছু মৌলিক অধিকার দিয়েছে; সেগুলো যাতে মেয়েরা নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। যেকোনো বিষয়ে শিক্ষা লাভের অধিকার, যেকোনো চাকুরি করার, ব্যবসা করার অধিকার, স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, নির্বাচনে দাঁড়াবার এবং দেশ শাসনে অংশ গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি কিছু অধিকার থেকে আগে নারীকে বঞ্চিত করা হ'ত। এখনো যে হয় না, তা নিশ্চিত করে কে বলবে? নাবালিকা মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছালে পুলিশ গিয়ে সেই বিবাহ বন্ধ করছে — এমন খবর আমরা পাই। প্রশাসন না জানতে পারলে বিবাহ হয়ে যায়। এমন দৃষ্টান্তও বহু আছে। এক্ষেত্রে সচেতন প্রতিবেশীদেরই উদ্যোগী হতে হবে অবুঝদের বোঝাবার জন্য। মেয়েদের অধিকার সুরক্ষার জন্য। আজ পরিবারে ছেলে ও মেয়ের সমানাধিকার। বাবা-মার সম্পত্তিতেও মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কোনো মেয়ে এক্ষেত্রে নিজেকে বঞ্চিত মনে করলে আদালতের সাহায্য চাইতেই পারে।

নারীকে সবদিক থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে সমাজেরই কল্যাণ হয়। পরিবারের; রাষ্ট্রের শান্তি ও সুনাম বজায় থাকে। ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি — সব জায়গায় উৎকর্ষতা বাড়তে থাকে। তাতে সুবিধা তো সর্বত্রই। তাই, নারী সুরক্ষা ব্যাপারে নারীদের তো সচেতন থাকতেই হবে, সচেতন থাকতে হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে। অবশ্যই সচেতন থেকে ঘরের মেয়েদের সঙ্গে পরের মেয়েদেরও সুস্থ, সুশিক্ষিত ও নিরাপদ রাখাটা সভ্য মানুষের কর্তব্য। প্রশাসনেরও কর্তব্য।

বিঃ দ্রঃ- মতামত একান্তভাবে লেখকের নিজস্ব। বক্তব্য-বিষয়ের দায়ভার সম্পাদকমন্ডলীর নয়।

ভাষাদিবস আয়োজনে অধ্যাপকবৃন্দ : ডঃ ইন্দ্রনীল মন্ডল, ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী, অধ্যাপক সৈয়দ এম. জামান, অম্বিকা সরকার , সুদীপ্তা সিংহ, বিশ্বজিৎ মন্ডল, চন্দন ঘোষ ও শিক্ষাকর্মী পরেশ কুমার পাল, হুমায়ুন কবির

"শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বনাম শিক্ষক"

— ড. রঞ্জিৎ কুমার সরকার (সহযোগী অধ্যাপক)

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে শিক্ষাদানের প্রাথমিক পর্বে বিভিন্ন টোল বা পাঠশালায় গুরুমশাইরা বলে যেতেন গুরু এবং ছাত্রেরা গুরুমশাই উচ্চারিত শব্দসমূহ আবৃত্তি করত। আবৃত্তি করতে করতেই একটি বিষয় বা বিষয়ের সূত্রাবলী ছাত্রদের মনে স্থায়ী আসন করে নিত। পরবর্তীকালে ছাত্র যখন শিক্ষক বা গুরুমশাই হতেন, তখন তিনিও একইভাবে শিক্ষাদান করতেন। কথিত আছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ "বেদ" এভাবেই শিক্ষাদান করা হতো। এইজন্যই বেদের অপর নাম "শ্রুতি"। এটাই ছিল প্রাচীনকালের শিক্ষাদানের বা শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি।

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের পদ্ধতিও ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। প্রথমেই এল তালপাতার উপর লেখা। শ্রুতির যুগ থেকে তালপাতায় লেখার যুগ, বলা যায় শিক্ষার এক ধরনের প্রযুক্তির প্রবেশ। কারণ তালপাতায় লেখার জন্য তালপাতাকে শুকনো করে, তার উপর লেখা যায় এমন কালি ও কলমের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এগুলি ছিল এক ধরণের প্রযুক্তি। এরপর ধীরে ধীরে এল কাগজ-কলম-কালি। পূর্বের ফাউন্টেন পেন থেকে বল পয়েন্ট পেন হয়ে বর্ত্তমানের জেল পেন — পুরোনো প্রযুক্তি থেকে নতুন প্রযুক্তিতে ক্রমাগত উত্তরণ, এমনই চলছে। তারও পরে প্রিন্টিং মেশিন এবং পরবর্ত্তী কালে প্রেসের আবিষ্কার এবং তার বহুল ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিল। শিক্ষার বিষয়গুলি বইয়ের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া শিক্ষাক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রিন্টিং মেশিনের পর আজকের জেরক্স মেশিন বা ফটোকপিয়ার। এর মাঝে ম্যানুয়াল টাইপরাইটার থেকে ইলেক্ট্রিক টাইপরাইটার এবং তারপর আজকের কম্পিউটার এবং ডাটা স্টোরেজ ডিভাইস বা তথ্য সংরক্ষণের যন্ত্র।

ক্লাসরুম বা শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির যে রূপান্তর দেখা যায়, তা'হল তথাকথিত চক-ডাস্টার-ব্ল্যাকবোর্ড থেকে বর্তমানে সাদা বোর্ড যাতে কলম দিয়ে সহজে লেখা যায় এবং সেই লেখা সহজেই মুছে ফেলা যায়। এরপর এসেছে ওভারহেড প্রোজেক্টর যার সাহায্যে প্লাস্টিকের উপর লিখে দেওয়া তথ্য সাদা দেওয়ালে বা পর্দায় প্রতিস্থাপিত করা যায়। একে প্লাস্টিক ট্রান্সপারেন্সি বলা হয়। ওভারহেড প্রজেক্টরের যুগ এখনও চলছে বটে, তবে বর্তমানে বেশি জনপ্রিয় কম্পিউটারের মাধ্যমে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। এই প্রেজেন্টেশনের জন্য বিশেষ ধরণের প্রজেক্টর (ডিজিট্যাল ডিসপ্লে) লাগে। এর থেকেও উন্নততর প্রযুক্তিও এসেছে বাজারে, যেখানে প্রেজেন্টেশন চলাকালীন কথাবার্তা বা লেখা প্রেজেন্টেশনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া

যায় এবং পরবর্তী প্রেজেন্টেশনে এগুলিকে তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ সবই প্রযুক্তি এবং বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে এগুলির ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

এছাড়াও, বইয়ের পরিবর্তে আজকাল তথ্য কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সি.ডি. -তে ধরে রাখা হচ্ছে। এই সি.ডি.-র মূল উপাদান হল পলিকার্বনেট নামক এক ধরণের বিশেষ প্লাস্টিক, যা তথ্য ধরে রাখতে সক্ষম। অবাক হওয়ার ব্যাপার হল এই যে, এক লক্ষ A4 মাপের কাগজে যতখানি তথ্য ধরে রাখা সম্ভব, সমপরিমাণ তথ্য দশ গ্রাম পলিকার্বনেটে সংরক্ষিত করে রাখা সম্ভব। এই পলিকার্বনেট প্লাস্টিকের উপর থেকে অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা আবরণ থাকে যার জন্য সি.ডি. বাইরে থেকে দেখতে চকচকে। এক লক্ষ A4 মাপের কাগজকে সম্বলিত করে যে বই, তার মাপ এবং সেই বইকে শেল্‌ফে বা তাকে রাখতে যে পরিমাণ জায়গা লাগবে তা ভাবলেই চিন্তা আরও বেড়ে যায়। অথচ পাশাপাশি একটি CD-এর যে মাপ তাতে তাকে রাখার জন্য অতি সামান্য জায়গাই যথেষ্ট। এই কারণেই বর্তমানে CD-এর ব্যবহার এত ব্যাপক। বর্তমানে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত এবং আরও অনেক জায়গায় CD-এর ব্যবহার এত ব্যাপক। ইদানিং কালে ডিজিটাইজেশনারের যে প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে তা এই কারণেই — তথ্যকে অল্প পরিসরে সংরক্ষিত করে রাখার প্রয়াস। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েই চলেছে — বিশেষত গ্রন্থাগারসমূহে।

ইদানিং কালে, আমাদের দেশে আরও এক ধরণের অতি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে (খুব সীমিত ক্ষেত্রেই অবশ্য) যেখানে একটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে আর একটি বিদ্যালয়ের, একটি কলেজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা দেশের একটি কলেজের সঙ্গে বিদেশের একটি কলেজের ক্লাসরুম কানেক্টিভিটি তৈরি হবে। এর ফলে আমাদের দেশের কোন একটি কলেজের সঙ্গে বিদেশের কোন একটি কলেজের দুটি ক্লাসরুমের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। বিদেশের কলেজের ছাত্ররা আমাদের দেশের কলেজ শিক্ষকের বক্তৃতা শুনতে পারবেন। তেমনি, বিদেশের কলেজের শিক্ষক বিদেশের ক্লাসরুমে দাঁড়িয়েই পড়াবেন আমাদের দেশের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীকে। এইভাবে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার যে কোনও দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে চলে আসবে। এর ফলে জ্ঞান বা নলেজ স্পেস ও টাইমের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সহজেই বিস্তৃতি লাভ করতে পারবে।

এতো গেল শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের দিকটি। এবার শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাদান বা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রথমেই যে প্রশ্নটি ওঠে, সেটি হ — সব কিছু যদি প্রযুক্তির মাধ্যমে করে ফেলা সম্ভব হয়, তবে শিক্ষকের কি কোনো গুরুত্বই থাকবে না? এ উত্তরে বলা যায়, সভ্যতার বিকাশের পথে শিক্ষাক সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাঁকে কখন

অস্বীকার করা যাবে না। শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে মস্তিষ্ক, হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। তথ্য কান বা চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছালেই হবে না, রস গ্রহণের জন্য তথ্য বা তত্ত্বকে হৃদয়ে পৌঁছাতে হবে। বিষয় হৃদয়গ্রাহী না হলে তা কখনও প্যাশন সৃষ্টি করতে পারবে না। শিক্ষকের ভূমিকা হল একটি বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করা, বিষয়কে যথার্থ পারস্পেক্টিভে স্থাপন করা, যাতে একটি বিষয়ের অধ্যয়ন এক ধরণের হোলিস্টিক ধারণা তৈরি করতে পারে। এক ধরণের বিশ্ববোধ তৈরি করতে সক্ষম হয়। তথ্য বা তত্ত্ব মনে বা হৃদয়ে স্থাপন করার ব্যাপারটা পুরোটাই নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। যে শিক্ষক তথ্য বা তত্ত্বকে ছাত্রদের মনে বা হৃদয়ে স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং তিনি নিজেই যদি বুঝতে পারেন যে তাঁর উপস্থাপিত তথ্য বা তত্ত্ব ছাত্রদের হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে, তবে তিনিই একজন আদর্শ শিক্ষক। তাঁর শিক্ষাদান তখনই সার্থক হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ড. ভবতোষ দত্তের (যিনি প্রসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন ও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষা অধিকর্তা (D.P.I) হিসাবে অবসর নেন)। একটি বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে। তিনি তাঁর 'আট দশক' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, - "পড়ানো একটা জিনিস, শিল্পই। গান গাইতে পারি না, কবিতা লিখতে পারি না, ছবিও আঁকতে পারি না। কিন্তু জীবনের কোন একটা দিকে তো নিজেকে প্রকাশ করব। পড়ানো হল সেই প্রকাশের একটা দিক। আমি একটা জিনিস নিজে যতটা বুঝি, সেটা আরেকজনের বোধের মধ্যে (অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে) চালান করে দিলাম এবং আরেক জন সেটা হৃদয়ের মধ্যে নিতে পারল না কিনা, সেটাও আমি যখন বুঝতে পারি, তখন এই তৃতীয় অর্ডারের বোঝার মধ্যে এক বিশাল আনন্দ রয়েছে এবং তখনই পড়ানো বা শিক্ষাদান সার্থক হয়ে ওঠে।" এছাড়াও শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীকে জীবনের মূল্যবোধগুলি শেখাতে পারেন, মানুষে মানুষে সহমর্মিতা সৃষ্টিতে এবং একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বহু প্রখ্যাত শিক্ষকের ছাত্র দরদী হিসাবে বহু উদাহরণ আছে। তার মধ্যে মহামতি ডেভিড হেয়ারের একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। হেয়ার সাহেব ছাত্র মহলে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে ছাত্রদের অহরহ যাওয়া-আসা ছিল। একদিন একজন ছাত্র হেয়ার সাহেবের বাড়ীতে গভীর রাত পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পরে বাড়ী যেতে উদ্যত হলে হেয়ার সাহেব তাকে কিছু পথ এগিয়ে দিয়ে তাঁর বাড়ীতে ফিরে আসেন। বাড়িতে ফেরার পরে হেয়ার সাহেবের মনে এক ধরণের দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, তাঁর মনে হয়, ছাত্রটি ঠিকমতো বাসস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে কিনা। হেয়ার সাহেব ঘরে স্থির থাকতে না পেরে প্রায় মধ্যরাতে তিনি ছাত্রটির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে ছাত্রটি ঠিকমত বাড়ীতে পৌঁছেছে। তখন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে আসেন তিনি। এই রকম আরো বহু উদাহরণ আছে।

ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই যে দরদ, এই সহমর্মিতা — প্রযুক্তি কোনদিনই তা প্রদান করতে পারবে না। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা এক সাধারণ ছাত্র, তাকে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখাতে, দারিদ্র অবহেলার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার স্বপ্ন দেখাতে প্রযুক্তি কোন দিনই সফল হবে না। এই অসাধ্য সাধন করতে পারবেন কেবলমাত্র শিক্ষাই এবং শুধু এই কারণেই সমাজকে বারবার শিক্ষকের দারস্থ হতে হবে।

প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষক আরো সফল হয়ে উঠবেন ঠিকই, কিন্তু যন্ত্রী ছাড়া যন্ত্র হয়ে যাবে প্রাণহীন। সেতারের তারে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে যেমন অসামান্য সুর তোলেন কোনো বিখ্যাত শিল্পী, একটি সাধারণ ছাত্র বা ছাত্রীকে জ্ঞানের আলোকে তেমনই উদ্ভাসিত করতে পারেন এক জন শিক্ষক বা শিক্ষিকা। ছাত্র-ছাত্রীর হৃদয় জুড়ে বিরাজ করেন তাঁরা, অমর অক্ষয় হয়ে। প্রযুক্তি কখনোই ছাত্রের হৃদয় থেকে শিক্ষকের আসন অপসারণ করতে পাবে না।

তবে এটাও ঠিক যে, এমন একজন শিক্ষক হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষককেও সারা জীবন সাধনা ও সংগ্রাম করতে হয়। অতীতের বিখ্যাত শিক্ষকদের জীবন চর্চা করলে আমরা তার প্রমাণ পাই। শাস্ত্রে বলে "পিতৃদেবো ভব, আচার্য দেবো ভব"। পুত্র বা কন্যার সঙ্গে পিতার যে সম্পর্ক বায়োলজি নির্ধারিত তাকে অতিক্রম করে পুত্র বা কন্যার কাছে পিতার পিতৃদেব হয়ে ওঠা পিতার নিরন্তর, সংগ্রাম সারা জীবনের সংগ্রাম। তেমনি বৃত্তি নির্ধারিত সম্পর্ক, শিক্ষককুলের আচার্যদেব হয়ে ওঠার প্রয়াস ও এক অন্তহীন সংগ্রাম সারা জীবনের সংগ্রাম। ছাত্রদের কাছে "আচার্যদেব" হয়ে ওঠাটা এ বড় কম প্রত্যাশা নয়, বড় কম দাবি নয়। তার জন্য শিক্ষককে নিজেকেও ঘষে মেজে তৈরি করতে হয়। তাই শিক্ষককে আহ্বান জানিয়ে বলি "আসুন, শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত আমরা সকলে আচার্য হয়ে ওঠার জন্য গভীর অনুশীলনে ব্রতী হই শিক্ষক জীবনকে সার্থক করে তুলি।"

কবিতা কোলাজ ঃ পরিবেশনায় সংস্কৃত বিভাগ

'The Religion of the Forest', 'Tapoban' and 'The Message of the Forest': Tagore's Green Writing and Beyond

Dr. Suddhasattwa Banerjee
Assistant Professor in English,
Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum.

In this paper, my attempt would be to critically engage with some of Tagore's works e.g. "The Religion of the Forest", "Tapoban" and "The Message of the Forest" and show Tagore as an eco-conscious writer who, way back in the first two decades of the twentieth century anticipated some of the fundamental premises of the recent discourse of Ecocriticism. I shall also try to historicise this Green Reading of Tagore in its contributive aspect to his notion of anti- colonial/ postcolonial inscription, thereby foregrounding his relevance as a practical environmentalist to combat the threat of Global Warming and Climate Change in the twenty- first century. While dealing with "The Religion of the Forest" from Tagore's Creative Unity we have to trace back the time defying notion of the forest, put forward in this essay to a Bengali essay, "Tapoban" anthologised in his book Santiniketan and written between 1909 and 1916. In another lecture, "The Message of the Forest" we find the key ideas of the essay under discussion. We have to take these three texts into our critical span to get a coherent picture of Tagore's Green Writing and in this context I would like to trace certain aspects in them that do not only remain limited within the well-defined premise of Ecocriticism. This journey beyond Green Writing is a result of Tagore's organic way of thinking, reading and writing with a unique gesture in an age when everything was fast transforming into the mechanical, rather the mechanized. His broad ecological perspective grew and matured over time and eventually recycled to meet the demands of his contemporary history. His pantheistic vision was flexible enough

to incorporate within it the Upanishadic philosophy of material renunciation, self- determination and the search for the divine infinite nature. According to him the kernel of India's value system is that of reconciliation of the diverse. This is the teaching of the hermitage, which is inscribed in the cultural memory of India: The hermitage shines out in all our ancient literature, as the place where the chasm between man and the rest of creation has been bridged. Citing the texts like Abhigyanam Shakuntalam, Kumara Sambhabam and The Ramayana, he observes a symbiotic relationship between man and nature in the vast biosphere of the forest. He even notices that that the entropy of material wealth and prosperity was gradually threatening this equilibrium and the poems of Kalidasa contained "a warning against the gorgeous unreality of that age, which like a Himalayan avalanche was slowly gliding down to an abyss of catastrophe".

Juxtaposing Europe's mastery over the elements of nature through the use of machines to the Indian ideal of syncretism, Tagore views: "For us the highest purpose of this world is not merely living in it and making use of it but realizing our own selves in it through expansion of sympathy; not alienating ourselves from it and dominating it, but comprehending and uniting it with ourselves in perfect union". Thus the synonymity between external and internal nature is established through the word 'Sacchidananda'. It is for this reason that, according to Tagore, Rama could become a hero even in his exile by sympathising with nature, not by dominating it. So, for Tagore nature was manifest not as an inanimate periphery; rather it came up as the sublime centre around which our lives evolve: That is why, when Sita was taken away, the loss seemed to be so great to the forest itself. Interestingly, this perception of Tagore anticipates two recent ecocritical coinages.

The symbiotic equilibrium that Tagore saw in ancient Indian civilization has been recently termed as the 'Biotic Community' in an alternative manner by the Norwegian ecocritic Arne Naess. Influenced by the Buddhist Doctrine

of the non-harming of all beings, Naess views Biotic Community as a constellation of interconnected human and non-human entities. Its balance must be preserved to secure the future Ecosphere as a whole. The establishment of Brahmacharyashrama in Santiniketan, then, can be simultaneously seen as the reiteration of an alternative cultural and Biotic Community where students were educated to be one with nature and not to harm its balance in any way. Education was a means to attain this union, rather than becoming an end in itself. James Lovelock, in another instance, puts forward his 'Gaia Hypothesis' which foregrounds a complex and multifaceted entity involving earth's Biosphere, atmosphere, oceans and soil. It is a totality constituting a proportionally organic system that operates like a living organism. Tagore's poetic, rather philosophical perception could initially sense this now-available ecological doctrine in a much earlier time. We are familiar with the notion of history as a repository of human phenomena. Nature is seen as a cultural construct that is made available to us through multiple discursive practices, which undermines the over- determined relationship between nature and culture and the very existence of an essential nature in the reality.

When in his "The Message of the Forest", Tagore views, "Man's history is organic, and deep-seated life-forces work towards its growth" he seems to radically deconstruct thisposition. In his essay "Tapoban" Tagore notes that the geographic, rather climatological location of a race is one of the key components in determining its cultural fate, and the collective mental structure also. So, the race that was nurtured by the sea-shore excelled in commerce, people whose spiritual appetite was not satiated in the barren and hostile climate of the desert, eventually turned towards conquering material wealth. Similarly, the untamed nature in the form of sea posed before the "Northmen" of Europe the challenge to fight and dominate over it. The reason behind this belligerent attitude of Europe towards non-Europe then actually lies in the natural setting in which the civilization has flourished. Tagore through this

'greening' of his perception of historiography, was actually writing against the colonial paradigms of writing against the colonial paradigms of writing history: a history that had been reduced to some empirical database of anthropocentric phenomena.

Interestingly, Tagore's position also undermines the stereotypical construction of the topos of the entire non-Europe as a feminine entity, by locating in the Indian forest the notion of spiritual communion of man with nature; the oneness that has been ruptured in the European ethos. It is at this point, that the dialogic encounter between post-colonialism and ecocriticism becomes evident. Post-Colonial criticism has been resolutely human-centred; committed first and foremost to the struggle for social justice, post-colonial critics have been insufficiently attuned to ecological issues and concerns. But in recent years it is gradually becoming aware of the threat of ecological imperialism. For Ramachandra Guha the empire's "forced march to industrialization" has had disastrous cultural as well as ecological effects in the colonial and post-independence India, rupturing the biodiversity and making cultural osmosis and plurality impossible. Among the races that encountered with India, the British were the first to play with the fundamental base of Indian economy. They detrimentally tried to convert the village -based agrarian economy of India to a city-centred industrial one. Jonathan Bate argues that colonialism and deforestation have frequently gone together.

To historicize Tagore's eco-conscious, anti-colonial response, it will be useful here to briefly chalk out the British Forest Policy in the colonial India. Around 1860, the empire caused a fierce onslaught on Indian forests because of the increasing demand of timber for military purposes, British Navy, and local constructions like roads, railway sleepers etc. When the forest was not seen as the revenue-generating force, it was destroyed in the name of agricultural prosperity. The British took note of the potentials of Indian forests as a source of revenue from around 1807. In the Forest Act of 1878

the rights of community were taken away, alienating them from forest management. Forests were classified into three broad categories:

1. Reserved Forests
2. Protected Forests
3. Village Forests.

Among these three types only the last one insufficiently meets the needs of local communities, whereas the right of the mass is only recorded on the second type but it had no practical use. These Protected Forests were gradually converted into Reserved Forests, which signify complete alienation of the indigenous mass.

The National Forest Policy (1894) audaciously declared: Where ever an effective demand for culturable land exists that can only be supplied by a forest area, the land should ordinarily be relinquished without hesitation.....forests which are the reservoirs of valuable timbers should be managed on commercial lines as a source of revenue to the states. In this manner, we can situate Tagore's anti-colonial response in the essay under discussion in a climate which was continually being threatened by the actual violation of physical environment, and Tagore might have been aware of it. Can we say that in the larger context of history, the essay emerges as a critique of such malpractice of 'Ecological Imperialism", simultaneously with its explicit stress on the moral debasement of the human world? The ransacking of wealth by the colonizers rendered Indian villages into impoverished lands, which according to Tagore were the heart of Indian economy.

Unlike Gandhi's pre-modern/ anti-modern village community, he initially embraced technological modernity to give the villages a financial uplift. The intention was to draw some virtuous result out of it. But Tagore was increasingly becoming aware of the breach between the possibility and the outcome. In the name of global progress, technological modernity was slow-poisoning human morals, breeding avarice by the capitalist enclosure of hu

manity, whereas, globalization meant for him the globalization of values. The extreme idealization of rationality and technology put forward by Europe was for Tagore antithetically menacing for human salvation. In another essay Tagore pessimistically notes, "Today our homes have dissolved into hotels, community life is shifted in the dense and dusty atmosphere of the office, man and woman are afraid of love" and wonders whether science can at all be 'humanized'. He left it entirely upon science "to bring back sanity to the human world by lessening the opportunity to gamble with fortune". In his last years this feeble faith on the prospect of a fruitful application of technology would also go "bankrupt altogether". So far I have tried to show Tagore as a Theorist who was aware of his environment. But his negotiation with environmentalism was not limited only to abstract theorization. The rural reconstruction work at Sriniketan bears a practical example of it. His insistence on the development of cottage- industries, the introduction of festivals like Vriksharopana (tree planting) and halakarshana (ploughing) posit him as an activist who was painstakingly trying to restore the values, lost in the ancient Indian civilization and to relocate it in his 'modern' hermitage: Visva-Bharati. Ecocriticism, according to Glotfelty, is at present a "predominantly white movement", arguably lacking the institutional support-base to engage fully with multicultural and cross-cultural concerns.

Tagore's essay interestingly provides us with this alternative perspective much before even the inception of ecocriticism. Ecological concern came to Tagore being interwoven with moral, rather ethical issues. He could not find any chasm between them because, for him nature was an embodiment of the divine morality: something that man was supposed to reveal in his personality. This attitude paved his way towards the cosmopolitan, rather universal dissemination of values, which defied any kind of socio-cultural codification or chronological specificity. Green writing is not a stable form of reaction to a stable problem. In our neo- colonial reality, global warming has

কলেজ প্রাঙ্গনে যোগাভ্যাস

প্রজাতন্ত্র দিবসে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী দেবব্রত সাহা মহাশয়

NCC আয়োজিত NATIONAL CADER CROPS DAY পালন

শারদীয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ ও অধ্যাপক ডঃ বংশীধর সাহু

দিশারী

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের তাৎপর্য্য আলোচনায় অধ্যাপকমন্ডলী

যোগাসনে নিরত শিক্ষার্থীরা

রবীন্দ্র- জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ গৌতম সেন,
সহযোগী অধ্যাপক ডঃ রঞ্জিত কুমার সরকার,
সহযোগী অধ্যাপক ডঃ চৈতন্য বিশ্বাস,
সহকারী অধ্যাপক ডঃ বংশীধর সাহু,
শিক্ষাকর্মী শ্রী হুমায়ুন কবীর

শারদীয়ার অনুষ্ঠানে NCC-র নিবেদন

come up as a threatening offspring of European late- capitalist, rather consumerist vision of economic progress, in a more disastrous manner than what was there in the time of Tagore. Shall we still not pay any heed to his word when he says, "For India to force herself along European lines of growth would not make her Europe, but only a distorted India". It is not only a conscious attempt to deviate from the European way of ecoconsciousness, but it is also a recognition on the part of Tagore to recognize and reiterate the Natural as the force that sustained man. Tagore also recognized that to generate this awareness and respect he required a language of spirituality and deification that would formalize and aestheticize this awareness to inculcate the sense of importance of nature among his fellow citizens and ashramites. The poetic, aesthetic, environmental and the pedagogic came together within these works as Tagore wore a mythical presence of nature within the human and it is startling to find the relevance of Tagore's thoughts in the modern ecological theorizations like Nicholas Polunin's Growth Without Eco Disaster and Henry Frankfort's Kingships and the Gods.

স্বচ্ছ ভারত অভিযান ঃ
হীরালাল ভকত কলেজ NCC বিভাগ

সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা

– সুকুমার মন্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ

"ভারতীয় সুন্দরবন কর্কটক্রান্তীর দক্ষিণে ৮৮° -২৯' পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২১°-৩০' উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। সুন্দরবন পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত প্রায় ১৪০ কি.মি. এবং চওড়া উত্তর থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ৫০-৭০ কি.মি. পর্যন্ত"। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ৩১টি ছোট বড়ো নদী আছে। এই সমস্ত নদী গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - কালেন্দী, রায়মঙ্গল, ইচ্ছামতী, মাতলা, হেড়োভাঙ্গা, গোসাবা, বিদ্যা এবং সপ্তমুখী। সুন্দরবন অঞ্চলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হল - হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, হাড়োয়া, সন্দেশখালি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হল - বাসন্তী, জয়নগর, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং, নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল গঠিত।

চাষাবাদের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলের বনভূমি ইজারা দেওয়া শুরু করে ব্রিটিশ সরকার ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। আর এই কাজ শেষ হয় আনুমানিক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। বেঙ্গল ডিভিশনে খাদ্যের ঘাটতি এবং ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েই ইজারা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন। এই ইজারা প্রকৃত পক্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি করার সফল প্রয়োগ। ব্রিটিশ সরকার কোষাগারের অর্থ ব্যয় না করে কৃষিজমির পরিমাণ বাড়িয়ে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য প্রথমে সাগরদ্বীপের বন অঞ্চলকে সংস্কার করা হয়। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বিঘা প্রতি প্রায় ১০ থেকে - ১২ মন ধান উৎপাদন হয়। তবে সব..... সমান হারে ফসল উৎপান হয় না। এর কারণ সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে মাটি সমান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। বেশির ভাগ জমি সারা বছর পতিত হয়ে পড়ে থাকে। ব্রিটিশ আমলে বন হাসিল করে আবাদ পত্তন এবং নদী বাঁধ দেওয়ার জন্য হাজিরাবাগ, সিংভূম, মানভূম, রাঁচি থেকে আদিবাসী সাঁওতাল, ওরাঁড়, মুন্ডা শ্রমিকদের আনা হয়েছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমান কৃষিজমিকে রক্ষা করা জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে বিস্তৃত নদী বাঁধ দেওয়ার জন্য সরকার শত শত কোটি টাকা খরচ করে। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এই অঞ্চলের ফসল।

এই অঞ্চলের ফসল উৎপাদনের জন্য যে জল প্রয়োজন হয় সেই জলের জন্য বর্ষাকালের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। সেচ ব্যবস্থা বিহীন বিস্তৃত এলাকার কৃষিজমি লবণাক্ততা এবং জলনিকাশী ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে একফসলি। বর্ষার জলের উপর নির্ভরশীল বেশির ভাগ জমি। এই অঞ্চলের চারিদিকে নদী গুলি সরাসরি সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য জোয়ারের সময় জল নদীতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় কোন সময় প্রবল নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড় শুরু হলে ঐ নদী গুলির বাঁধে ফাটল ধরে বা ধ্বংস নেমে জল

কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তখন হাজার হাজার একর কৃষিজমি লবণ জলে ভরে যায়। ফসলের ক্ষতি হয়। একবার লবণাক্ত জল যে অঞ্চলে প্রবেশ করে সেই অঞ্চলের সবুজ গাছপালা এবং মাটিকে সম্পূর্ণ লবণে ভরে যায়। ফলে নতুন করে ফসল উৎপাদন করতে গেলে এবং মাটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ৮ - ১০ বছর সময় লাগে। তবে মজার বিষয় যে, এই অঞ্চলের মানুষেরা পূর্বের তুলনায় অনেকটা সজাগ হয়েছেন। তারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের রক্ষা করার উপায় খুঁজে পেয়েছেন। এমনকি সরকার এই অঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন বারে বারে। চাষীদের বীজ, ধান, ফসল নষ্ট হবার জন্য সরকার অনুদান দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলে এমন নদী বাঁধ গুলিতে মাটির পরিবর্তে শক্ত কংক্রিটের বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। মানুষের সুবিধার জন্য এবং চলাচলের জন্য বড় বড় পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং খরার সময়ে ফসল উৎপাদনের জন্য বড় বড় পুকুর, খাল খনন করা হচ্ছে। এই অঞ্চলে একটা সময় চাল উৎপাদন হত প্রচুর পরিমাণে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, "১৯১৪ সালের আগে বালাম চাল আসত বরিশাল থেকে। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এই চাল একাই সরবরাহ করেছে সুন্দরবনের কৃষিক্ষেত্র। তখন এখানে পাটনাই চাল উৎপাদন হত প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু ১৯৪৭ - ৪৮ সালে ধানের উৎপাদন কমে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩১ ও ৩১৪ টন। ১৯৫০ সালে একর প্রতি ধান উৎপাদন হয় মাত্র ১৮ টন। ১৯৭১ সালে হয় মাত্র ১২/১৩ মন"।

বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় সমস্ত রকম ফসল উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ জল নিঃসরনের ব্যবস্থা থাকায় ও লবণাক্ত জল থেকে চাষের জমিকে বাঁধ দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্র গুলি খুব বেশি নষ্ট হতে পারে না। শাক-সব্জি, আমন ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত বিঘা প্রতি আমন ধানের উৎপাদন হত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে বেশি। মাছ, মধু ও জ্বালানি কাঠ প্রচুর পরিমানে আসে এই অঞ্চর থেকে। সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত হওয়ায় চাষাবাদের অনুপযোগী। কিন্তু পরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির জল সংরক্ষিত করে চাষাবাদের ব্যবস্থা হয়েছে। এই অঞ্চলের শতকরা ৯০ টি পরিবার কৃষির সহিত জড়িত। বাকি পরিবার অকৃষি ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে।

কৃষি হল সুন্দরবন অঞ্চলের অর্থনীতির ভিত্তি। আমন প্রধান ফসল হলেও বিপুলভাবে আউস ও বোরো চাষ হচ্ছে। লবণ জল হল সুন্দরবনে ফসলের শত্রু। যে কারণে বাঁধ দিয়ে চাষের গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে। সারা বছর বাঁধকে সংরক্ষণ করা হয়। পূর্বে বাঁধ গুলি জমিদাররা দেখাশোণা করতেন। বর্তমানে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ৩৫০০ কি.মি. বাঁধ আছে। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা হচ্ছে। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে কৃষকদের কৃষি পদ্ধতিও শেখানো হচ্ছে। সারা ঋতুব্যাপী চাষের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। উন্নত বীজ, সার ও

পোকামাকড় মারার ওষুধ সরবরাহ হচ্ছে। ১৯৭৯ সার থেকে ২৭টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে কৃষকদের সাহায্যের জন্য। এই সমস্ত জায়গা গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল নামখানা, বামনখালি, মহাদেব নগর, রায়দীঘি, যাদবপুর, নতুনহাট, মিনাখাঁ, গনেশপুর, বাসন্তী, হাড়োয়া, দয়াপুর, মথুরাপুর, দক্ষিণ বারাসাত, ছোটমোল্লাখালি, কালীনগর, দুলদুলি, ভাঙতুষখালি, ক্যানিং, ঘটিয়াশরিফ এবং বসিরহাট। আমন, আউস, বোরো প্রভৃতি ফসলের চাষ প্রায় বছরের বিভিন্ন সময়ে হচ্ছে ওই অঞ্চলে। ধান ছাড়াও ব্যাপক হারে লঙ্কা, উচ্ছে, তরমুজ, আম, তামাক, কুমড়ো, তুলা, সূর্যমুখী, গম, তিলি, মুগ, মুসুরি, সরষে, বাদাম, পেঁপে, লেবু, তিল, ছোলা, পেঁয়াজ, সয়াবিন প্রভৃতি চাষ হচ্ছে সর্বত্র। সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থাকে আরো সম্প্রসারণের জন্য বর্তমানে IFAD, State Bank এবং অন্যান্য জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে অর্থ যোগান দেবার জন্য। বর্তমানে সুগারবীট চাষের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই চাষে মাটিতে লবণের পরিমাণ কমে যায়। এই সুগারবীট থেকে চিনি উৎপাদন করা যেতে পারে। এমনকি এই সুগারবীট থেকে অ্যালকোহল ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরির কারখান স্থাপন করা যায়। কয়েকটি কারখানা তৈরি হলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলে বেশির ভাগ এক ফসলি এলাকা। সুষ্ঠ ব্যবস্থা নিলেও পরিকল্পনা মাফিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সব্জি চাষ সম্ভব। বাজার আছে এবং চাহিদা আছে। পাশে কলকাতার মত বিশাল জনবহুল শহর আছে। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে সব্জি চাষের প্রয়োজন। তার জন্য মাটির লবণের ভাগ কমাতে হবে। বৃষ্টির জল ধরে রাখতে হবে। সামান্য লবণ সহ্য করতে পারে এমন সব্জি চাষ করতে হবে। কৃষকদের উৎসহ দেওয়ার জন্য সরকারের নানা রকম পরিকল্পনা এবং যন্ত্রপাতি, ওষুধ, অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে হবে। সর্বপরি নদীর জল থেকে কৃষিক্ষেত্রকে বাঁচানোর জন্য বড় বড় শক্ত কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করতে হবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সর্বত্র রাস্তা তৈরি এবং মেরামত করতে হবে। সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বত্র বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলের ৮২ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :-

১) সুন্দরবন : মানুষ ও পরিবেশ, লেখক গৌতম কুমার দাস।
প্রকাশনা : - মিলিন্দ দে, লেভান্ত বুকস্।
২৭ সি ক্রিক রো, কলকাতা-১৪,
প্রথাম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৫

২) চব্বিশ পরগণা : উত্তর-দক্ষিণ, লেখক - কমল চৌধুরী।
প্রকাশনা : - দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩
প্রকাশক : - সুভাষচন্দ্র দে, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৯, ডিসেম্বর।

Toxic heavy Arsenic contamination in Bengal Basin Aquifer : Impact on Biotic Environment

Kritiman Biswas
Assistant Professor
Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

Arsenic is a toxic heavy metal and carcinogenic. Arsenic crisis in India dates back as early as 1976 when a preliminary survey on it in dug Wels, hand pumps and spring water from Chandigarh and different villages of Punjab, Patiala, Haryana and Himachal Pradesh in northern India was reported by Dr. D. V. Dutta.

Official, Arsenic poisoning in W.B. was first diagnosed by a dermatologist Dr. K. C. Saha of School of Tropical Medicine in Kolkata to an outdood patient of village Ramnagar of Barauipur police stattion in the district of South 24th Parganas on 6th July 1983. Later it came out that many Arsenic affected people/patients existed in many villages well before 1983; but they could not be clinically diagnosed, so were not highlighted. Garai et. al. reported the first scientific paper published on Arsenic toxicity in W.B. where he had warned of malignancy of the hyperkeratotic spots and liver if diagnosis is delayed. Then, the School of Environmental Studies, JU, Kolkata joined the Arsenic work at the begining of 1988.

The state W.B. can be divided into four physiographic zone : (i) Districts of Darjeeling, Jalpaiguri, Coochbehar and Alipor Duar in the Himalaran region. (ii) Distictof Purulia and western part of the district of Burdwan, Medinipur, Birbhum and northern part of Bankura occupy the eastern fringe of Chotonagpur plateau. (iii) Sundarban area of the South 24th Parganas and a small part of north 24th Parganas form the deltaic zone. (iv) Remaining areas of the state being plains.

the depth range 50 feet to 170 feet below ground surface have been found to yeild Arsenic.

The Arsenic contents of hair samples of affected persons of Malda, Murshidabad, Nadia, 24th Parganas North and South and Kolkata areas, was found to be from 1.84 to 31.05 mg/kg (Normal values 0.08 to 0.25 mg/kg), nail samples 1.47 to 52.03 mg/kg but normal values 0.43 to 1.08 ppm and urine sample 0.05 to 2.0 micro gram / ml but normal range 5 to 40 micro gram / day. Seven districts where arsenic patients were found clinically about 9356 (9.7%) patients have been registered and out of them 778 (5.6%) Patients are children.

When people drink Arsenic contaminated water, it begins to kill slowly but painfully, can take eight years to fourteen years to be mainfested in person. The few diseases are common in affected areas persons who regularly drink Arsenic contaminated water and use it for cooking as below :
i. Melansia : spotted pigmentations on skin leading to cancer, ii. Keratosis, iii. Anaemia, iv. Dry cough, v. Stomach pain, vi. Diarrheoea, vii. Liver enlargement, viii. Haemolysis / destructions of red blood cells.

REFERENCES :

i. Santra, S.C. Environmental Science, New central book agency Private Ltd., Kolkata.
ii. DE, A.K. Environmental Chemistry, New age International Publishers.
iii. http://www.soesju.org/arsenis/wb3htm.
iv. Ground water arsenic contamination W.B., reported work done by SOES, Kolkata W.B.

প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক প্রভাবে বিপন্ন পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

– ড. বংশিধর সাহ
গণিত অধ্যাপক

'প্লাস্টিক' আমাদের জীবনে এক অত্যাবশকীয় প্রয়োজনীয় উপাদান। প্লাস্টিক ছাড়া আমরা যেন কিছুই ভাবতেই পারি না। রাস্তা-ঘাট, বাজার, হাসপাতাল, কৃষিক্ষেত্র, ভ্রমণক্ষেত্র সর্বত্রই প্লাস্টিকের ব্যবহার যথেচ্ছ ভাবে হচ্ছে। কোনো কিছু করতে গেলেই প্লাস্টিকে হাত লাগাতেই হবে। অর্থাৎ আমাদের জীবন প্লাস্টিকের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তবে একটি প্রশ্ন বারবার উঁকি দেয় — প্লাস্টিক কি? কি ভাবে তৈরি হয়? প্লাস্টিক কি?

১৮৯৮ সালে, এক রসায়নাগারে কোনো এক পরীক্ষা চলাকালীন বিখ্যাত রসায়নবিদ হানস ভন পেচমান হঠাৎ করে টেস্ট টিউবের তলায় মোমোর মতো দেখতে এক ধরনের পদার্থ আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হয়ে এবং বর্তমানে 'পলিথিন' নামে পরিচিত। কিন্তু এই ধরনের পদার্থ তখন স্থিতিশীল ছিল না। পরবর্তী কালে ১৯৩৯ সালে মিচেল পেরিন এক স্থিতিশীল ও নমনীয় পলিথিন আবিষ্কার করেন। নানান গবেষণার পর ১৯০৭ সালে সম্পূর্ণ ভাবে 'প্লাস্টিক' আত্মপ্রকাশ করে।

'প্লাস্টিক' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'প্লাস্টিকোস' থেকে যার অর্থ হল একে খুব সহজে গরম করে বিভিন্ন ধরণের আকৃতির দেওয়া যায়। তবে প্লাস্টিকের জেনেরিক নাম হল 'পলিমার' - কার্বন যুক্ত পদার্থ। সেইজন্য প্লাস্টিক কে এক কথায় বলতে পারি — প্লাস্টিক একটি পেট্রোলিয়াম জাত কার্বন জনিত পদার্থ।

আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে পেট্রোলিয়াম জাত পদার্থের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করে আলো, পরিবহন, কলকারখানা সচল রাখতে পারি। কিন্তু প্লাস্টিক জাত পদার্থ উৎপাদন করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম প্রয়োজন হয়। সারা বিশ্বে বছরে গড়ে প্রায় ৮০-১০০ মিলিয়ন বেরেল তেল লাগে প্লাস্টিক তৈরি করতে। তাই প্লাস্টিক তৈরিতে প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ লাগছে।

প্লাস্টিকের ব্যবহারিক পরিসংখ্যান ঃ

আমাদের জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার অতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। খেলনা, জলের বোতল, পেকিং, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, ঘর সাজানোর সামগ্রী, ক্যারি ব্যাগ ইত্যাদি প্লাস্টিক ছাড়া ভাবাই যায় না। ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা বিশ্বে বছরে গড়ে ৯.১ বিলিয়ন টন (৮.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন) প্লাস্টিক জাত দ্রব্য উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ৬.৯ বিলিয়ন টন (৬.৩ বিলিয়ন মেট্রিন টন) প্লাস্টিক ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়। এই ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের মধ্যে মাত্র ৯% পুনরায় ব্যবহার যোগ্য, ১২% ভষ্যিভূত, আর বাকি ৭৯% ভূপৃষ্ঠ-সমুদ্রে জমা হয়। এই ক্রমবর্ধমান ভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর উপর ১৩.২ বিলিয়ন টন (১২ বিলিয়ন মেট্রিন টন) প্লাস্টিকের স্তর সৃষ্টি হবে।

বর্তমানে বিশ্বে ৪ মিলিয়নের বেশি কর্মী এই প্লাস্টিক উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত। ভারতবর্ষে প্লাস্টিক উৎপাদক কারখানার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ২০১৭-২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে

১৬.৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানান ক্ষেত্রে যে প্লাস্টিক ব্যবহার করে থাকি, এর মধ্যে প্যাকিং - ৩৫%, বিল্ডিং তৈরির সরঞ্জাম - ২৩%, ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স - ৮%, ফার্নিচার ও ঘর সাজানো - ৮%, ট্রান্সপোর্ট - ৮%, কৃষিক্ষেত্র - ৭%, খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম - ৩%, অন্যান্য - ৮% ব্যবহৃত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক প্রভাব :

সারা ভারতে গড়ে ১০-১৩ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়। প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক জাত পদার্থ যেমন - প্লাস্টিক খেলনা, ক্যারি ব্যাগ, জলের বোতল একবার ব্যবহার করে রাস্তা, পার্ক, বাগান, সমুদ্র তটে ফেলে দিই। কিন্তু প্লাস্টিক সহজে নষ্ট হয় না। প্রায় ১০-১০০ বছর সময় লাগে প্লাস্টিক নষ্ট হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে। উদাহরণ স্বরূপ প্লাস্টিক বোতল ৭০-৪৫০ বছর, প্লাস্টিক ব্যাগ ১০০-১০০০ বছর, প্লাস্টিক চামচ ৫০-৪৫০ বছর সময় লাগে নষ্ট হতে। প্লাস্টিকের এই যথেচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার প্রাণীকূল ও পরিবেশের উপর ব্যাপক ভাবে প্রভাব ফেলছে। আমরা এই প্লাস্টিক কে সঠিক ভাবে ব্যবহার করছি না। ফলে নানান ধরনের রোগ, দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। নিম্নে প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হল —

১। প্লাস্টিকের পাত্র বা ব্যাগে যদি গরম খাবার রাখা হয় প্লাস্টিকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত কারসেনোজেনিক ডায়ক্সিন জাতীয় তরল উৎপন্ন করে খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। যা আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

২। প্লাস্টিকের ব্যাগ যখন পুকুর-নদী-সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, জলজ প্রাণী যেমন - মাছ, কচ্ছপ, অক্টোপাস খাবার ভেবে খেয়ে ফেলে এবং পেটের ভিতরে গিয়ে শেষে মারা যায়। সারা বিশ্বে বছরে প্রায় এক লক্ষ সামুদ্রিক প্রাণী ও দশ লক্ষ পাখি মারা যায় এই প্লাস্টিক খেয়ে।

৩। মাছ যখন প্লাস্টিক খেয়ে নেয়, তখন এই প্লাস্টিক থেকে এক ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যাল মাছের দেহে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা সেই মাছ খেয়ে নিলে ওই বিষ মাছের শরীর থেকে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে যা থেকে ফুসফুস - লিভারের ক্যান্সার, মস্তিষ্ক- হৃৎপিন্ডের সমস্যা, মধুমেহ রোগ বৃদ্ধি, শিশু জন্ম সমস্যা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

৪। প্লাস্টিক ব্যাগ সহজে নষ্ট হয় না। একটি প্লাস্টিক ব্যাগ নষ্ট হতে প্রায় ১০-১০০০ বছর লাগে। ফলে পৃথিবীর উপর প্লাস্টিকের একটি আস্তরন সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। এর ফলে মাটির নীচের কীট-পতঙ্গ মারা যাচ্ছে, গাছপালা-বনাঞ্চল বিস্তারে ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য, বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে।

৫। ক্রমাগত প্লাস্টিক ফেলতে থাকলে পৃথিবীর উপর প্লাস্টিকের একটি আস্তরন সৃষ্টি হয়। এর ফলে বৃষ্টির জল প্লাস্টিকের স্তর ভেদ করে মাটির নীচে পৌঁছাতে পারে না। এই ভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে পাণীয় জলের অভাব দেখা দেবে, বৃষ্টিপাত কমে যাবে।

৬। প্লাস্টিক ব্যাগের জল ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি এবং একটি ক্ষতিকারক পরিবেশ তৈরি করে। ফলে বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস জন্মায় যা থেকে নানান ধরণের রোগ দেখা দেয়।

৭। প্লাস্টিককে পোড়ালে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড এবং নানা বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় ফলে

পরিবেশ দূষিত হয়, দূরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হয়।

প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের ব্যবহারের নিয়ম ও বিধিনিষেধ :

প্লাস্টিকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও তার প্রভাব পরিবেশ-প্রাণীকূলের উপর পড়তে শুরু করেছে। নানান ধরনের অজানা দূরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এই ভাবে চলতে থাকলে আগামী ৪০-৫০ বছর পরে এই পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। তাই সারা বিশ্বে শ্লোগান উঠেছে - 'প্লাস্টিক হটাও পৃথিবী বাঁচাও'। ভারত সরকার প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর জন্য বিভিন্ন সময় নানান ধরণের বিধিনিষেধ নিয়ম প্রয়োগ করেছে। ২০০৩ সালে ভারত সরকার ঘোষনা করেছিল ২০-৩০ সেমি এবং ২০ মাইক্রন এর কম ঘনত্বের প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না। বর্তমানে ২০০৩ সালের এই নিয়ম পরিবর্তন করে ২০১১ সালে আর একটি নিয়ম চালু করে। যেখানে বলা হয়েছিল ৪০ মাইক্রন (১২-১৬ ইঞ্চি) এর কম ঘনত্বের প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক জাত দ্রব্য পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। এই নিয়মকে মান্যতা দিয়ে ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের নিয়ম ও বিধিনিষেধ চালু করেছে। এর একটি তালিকা পেশ করছি —

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য	প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার নিষেধ
১	অরুনাচল প্রদেশ	৬টি জেলায় নিষেধ
২	চন্ডীগড়	পুরো রাজ্য
৩	দিল্লী	পুরো রাজ্য
৪	গুজরাট	২টি জেলায় নিষেধ
৫	হরিয়ানা	পুরো রাজ্য
৬	হিমাচলপ্রদেশ	পুরো রাজ্য
৭	ঝাড়খন্ড	পুরো রাজ্য
৮	কেরালা	৩টি জেলায় নিষেধ
৯	মধ্যপ্রদেশ	গোয়ালিয়র শহরে নিষেধ
১০	নাগাল্যান্ড	পুরো রাজ্য
১১	মেঘালয়	পুরো রাজ্য
১২	উড়িষ্যা	তীর্থস্থানে নিষেধ
১৩	রাজস্থান	পুরো রাজ্য
১৪	সিকিম	পুরো রাজ্য
১৫	ত্রিপুরা	পুরো রাজ্য
১৬	উত্তরপ্রদেশ	গঙ্গা নদী থেকে ২ কিমি মধ্যে নিষেধ পরিবেশগত স্পর্শকাতর জায়গা
১৭	পশ্চিমবঙ্গ	তীর্থস্থান ও ঐতিহ্য মন্ডিত স্থানে নিষেধ

প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানোর কিছু অভ্যাস ও টিপস :

আমরা আমাদের জীবনে প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের ব্যবহার এতটাই বেশি করে ফেলেছি যে খুব সহজে প্লাস্টিক ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পরিবেশ এর ভারসাম্য ও আমাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে প্লাস্টিক ব্যবহার যতটাই কম করা যায় ততটাই ভালো। তবে আমরা যদি সতর্ক হয়ে থাকি ও কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি তাহলে প্লাস্টিক বর্জন বা ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব। এখানে আমি কিছু ব্যবহারিক টিপসের উল্লেখ করছি —

১) প্লাস্টিক কাপের পরিবর্তে কাঁচের গ্লাস বা মাটির ভাঁড়ে গরম চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস করা।

২) জল খাওয়ার পর জলের বোতল ফেলে না দিয়ে ওই বোতল অন্য কাজে যেমন চারা গাছ লাগানো, সৌখিন জিনিস বানানোর কাজে লাগানো যেতে পারে।

৩) প্লাস্টিক বোতল, খেলনা ব্যবহার করার পর ফেলে না দিয়ে অন্য কাজে পুনরায় ব্যবহার করা।

৪) বাজারে কেনা-কাটার সময় প্লাস্টিক ব্যাগ না চাওয়া। যদি কখনো প্লাস্টিক ব্যাগ চাইতে হয়, তাহলে প্লাস্টিক ব্যাগ গুলি না ফেলে দিয়ে একটি জায়গায় রেখে দিতে হবে পরে অন্য কাজে ব্যবহার করতে হবে।

৫) প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে কাগজ বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা। বাজারে যাওয়ার সময় ব্যাগ হাতে করে বের হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

৬) শিশুদের প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা না দিয়ে কাগজের তৈরি পুতুল, খেলনা ব্যবহার করতে দেওয়া ।

৭) খাবার রাখার জন্য প্লাস্টিকের পাত্রের পরিবর্তে কাঁচ, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কাঁসার বাসন ব্যবহার করা।

৮) হোটেল বা রেস্টুরেন্টে খাওয়ার সময় প্লাস্টিকের চামচ, গ্লাস, স্ট্র ব্যবহার করবেন না বা দিতে না বলবেন। প্রয়োজনে ধাতব চামচ সঙ্গে করে রাখতে পারেন।

৯) বাড়িতে প্লাস্টিক বিহীন থালা, গ্লাস, প্লেট, চামচ ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।

একটি সাধারন পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুল ধরছি একজন ব্যক্তি যদি কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করেন তাহলে তিনি সপ্তাহে কমপক্ষে ৬টি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার কম করবেন। অর্থাৎ মাসে ২৪টি প্লাস্টিক ব্যাগ কম ব্যবহার করবেন। সারা বছর কমপক্ষে ২৮৮টি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করেননি। তাহলে ভারতে ৫জন মানুষের মধ্যে ১ জন মানুষ এই রকম ভাবে চললে কমপক্ষে ৪১৪৭২০০ মিলিয়ন প্লাস্টিক ব্যাগ কম ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের জীবন যাত্রা একটু পাল্টে ফেলি তাহলে প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব।

প্লাস্টিকের ব্যবহারে সরকার ও প্রশাসনিক তরফে পদক্ষেপ :

দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক প্রভাব অনেক। তাছাড়া প্লাস্টিক ব্যবহার ত্যাগ বা হ্রাস করতে না পারলে আমাদের জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। তাই সরকারের তরফে নির্দেশ বা সতর্কতা জারি করতে না পারলে প্লাস্টিক ব্যবহার কম বা বর্জন করা সম্ভব নয়। সরকার নিম্নলিখিত পদ্ধতি গুলি নিতে পারে —

সুরের মূর্চ্ছনায় : অধ্যাপক অতনু ভট্টাচার্য্য

শারদীয়া ২০১৮

বিভাগীয় আলোচনাসভা: সংস্কৃত বিভাগের উপস্থিত অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ অধ্যাপক শ্রী বিশ্বরূপ চ্যাটার্জী, অধ্যাপক শ্রী কৃষ্ণ ধীবর এবং হীরালাল ভকত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ গৌতম সেন

NCC বিভাগ আয়োজিত
WORLD FORESTRY DAY পালন

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনঃ শারদীয়া ২০১৮ ডঃ চৈতন্য বিশ্বাস এবং অধ্যাপক শ্রী সলিল কুমার সেনগুপ্ত মহোদয়

কবিতা পাঠে ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জ্জী

৭০ তম প্রজাতন্ত্র দিবসঃ কলেজ প্রাঙ্গণ

প্রজাতন্ত্র দিবসে NCC কুচকাওয়াজ

১) প্রত্যেকটি বাজার, শপিং মলকে 'নো-প্লাস্টিক জোন' ঘোষনা করতে হবে।

২) হাসপাতাল, ভ্রমণক্ষেত্র, তীর্থস্থান, নদী-সমুদ্র এলাকায় প্লাস্টিক ব্যবহার কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩) কোনো ব্যক্তি বা দোকানদার ৪০ মাইক্রোনের কম ঘনত্বের প্লাস্টিক ব্যবহার করলেই জরিমানা করতে হবে।

৪) প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের উপর অনেক পরিমাণ ট্যাক্স ফেললে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার অনেকটাই কমে যাবে।

৫) প্লাস্টিক জাত দ্রব্য ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে না দিয়ে একটি জায়গায় সংগ্রহ করে রাখার নির্দেশ দিতে হবে।

৬) প্রশাসনের তরফে এলাকা ভিত্তিক কিছু সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে হবে যারা প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে ব্যবহৃত প্লাস্টিক ব্যাগ ও প্লাস্টিক জাত পদার্থ সংগ্রহ করবে। ওই সংগৃহীত প্লাস্টিক কে গুঁড়ো করে বিভিন্ন কাজে যেমন - রাস্তা, বাঁধ, বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারে।

৭) রাস্তা, বাজার, নদী-সমুদ্রে পড়ে থাকা প্লাস্টিককে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

৮) প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর কঠোর নিয়ম ও বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।

মন্তব্য ঃ এই প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের উপর আমরা ক্রমশই বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। এর ফলে আমাদের চারপাশ যেন প্লাস্টিকে মোড়া হয়ে পড়েছে। সব থেকে প্লাস্টিক ব্যাগ বেশি করে মাটি, জল, বাতাস দূষিত করছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ, ভূ-পৃষ্ঠে প্লাস্টিকের একটি আস্তরন সৃষ্টি করেছে। এর থেকে মানুষ, পশু-পাখি, জলজ প্রাণী সকল জীবের নানান ধরনের জটিল রোগের সৃষ্টি হচ্ছে ফলে মৃত্যু অনিবার্য। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী প্রজন্মের কাছে এই পৃথিবী বাসস্থানের অনুপযুক্ত হয়ে উঠবে। তাই এখন থেকে আমরা সাবধান না হলে আমাদের ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ সর্ব প্রথমে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করেছে। আরো অনেক দেশ এই ব্যবহার বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছে। পৃথিবী ব্যাপী শ্লোগান উঠেছে - 'নো প্লাস্টিক গো গ্রীন'। তাই আমরাও অন্যান্য দেশের মতো প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে পারি। আমাদের সচেষ্ট হতে হবে যতটা কম প্লাস্টিক জাত দ্রব্য ব্যবহার করা যায় বা সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করা যায়। তবেই 'এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব' আমরা।

উন্নয়ণের পথে হীরালাল ভকত কলেজ : নুতন চিন্তা-ভাবনা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম্থাগারিক

বিগত কিছু বছরে প্রত্যক্ষ করলাম যে হীরালাল ভকত কলেজ বীরভূম জেলা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কলেজ নানাদিকে নানারকম সাফল্য অর্জন করেছে। যেমন - সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই কলেজ আমাদের রাজ্য তথা সমগ্র ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি "মডেল কলেজের' তকমা পেয়েছে। হীরালাল ভকত কলেজ পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয়। কোনো জায়গায় যখন সেমিনার বা করফারেন্স বা কোন প্রয়োজনে যাই সেখানে আমার কলেজের এই কথা বলতে খুবই ভালো লাগে।

বর্তমান সময়ে কলেজ নানা দিক দিয়ে নানারকম উৎকর্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উৎকর্ষতা হতে পারে উচ্চশিক্ষায়, ক্রীড়াক্ষেত্রে, সমাজসেবায়, পরিকাঠামোয়, গবেষণায় বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে। যে দিক দিয়েই উৎকর্ষতা আসুক না কেন সেই উৎকর্ষতাকে সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপনা করার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠানের নান্দনিকতা বোধের দিকটি পরিস্ফুটিত হয়।

কলেজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের পরিদর্শন প্রায়শই হয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পরিদর্শন হল NAAC (National Assessment & Accreditation Council of India) - এর পরিদর্শন। কারণ এই পরিদর্শনের উপরই কলেজের আগামী কয়েক বর্ষের সামগ্রিক উন্নতি ভীষণ ভাবে নির্ভর করে। সুতরাং, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকেও বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন হয়ে থাকে।

এই সকল পরিদর্শনকারী দলের কাছে কলেজের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপনার জন্য কলেজ সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা আরো সুন্দর ভাবে করা যেতে পারে যদি কলেজের সমস্ত দিকগুলিকে একই জায়গায় শৌখিনভাবে তুলে ধরা হয়।

এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে কলেজে যদি একটা Documentary Archieve - তৈরি করা হয়। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে। যেমন, হীরালাল ভকত কলেজ তার প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে যে যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে তার বিভিন্ন ঘটনাবলী দৃষ্টিনন্দনভাবে ক্রমানুসারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখা যায়। যেমন - কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল, প্রতিষ্ঠাকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রতিষ্ঠাতাগণের নাম, কলেজের বিভিন্ন সময়ে যে যে বিভিন্ন কোর্স চালু হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত

বিবরণ, কলেজের বিভিন্ন সময়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্র, ক্রীড়াক্ষেত্র, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের বিবরণ, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কলেজ সম্পর্কে প্রতিবেদন, কলেজে বিভিন্ন সময়ের NAAC -এর পরিদর্শন; কলেজে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির তথ্যচিত্রসহ বিবরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি যদি এক জায়গায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা যায় তাহলে যেকোনো পরিদর্শনকারী দলের কাছে কলেজকে খুব আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা সহজভাবে করা যেতে পারে।

আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় এরফলে কলেজের দুই দিক দিয়ে উপকার হতে পারে। এক, পরিদর্শনকারী দলের কাছে কলেজের ধারাবাহিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ সুসংগঠিতভাবে (Well Organised)- হবে। আর দুই, অনেক সময় বর্ণনার সময় কিছু বিষয় বাদ পড়ে যাবার যে সম্ভবনা থাকে সেটা আর হবে না, পুরো ধারাবাহিক বিবরণ যথাযথভাবে করা যেতে পারে।

তবে এর জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কারণ কলেজে যে উন্নয়ন শুরু হয়েছে আশা করা যায় যে আগামী দিনে তা আরও ত্বরান্বিত হবে। তাই প্রথম ও প্রধান কাজ হল একটি আধুনিক মানের ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কক্ষ নির্মাণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিতে হবে। কারণ আগামীদিনে কলেজে আরও নতুন বিষয় আসবে। সুতরাং, কক্ষের যে স্থানে কোর্সের বিবরণ থাকবে সেই স্থানে কিছু জায়গাও রাখতে হবে যাতে করে পরবর্তীকালে সেখানে সেই নতুন বিষয়গুলি ঢোকানো যেতে পারে। শুধু তাই নয়, কক্ষসজ্জা এমনভাবে হওয়া দরকার যাতে করে পরিদর্শনকারী দলের কাছে কলেজের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধ ও রুচির দিকটাও ধরা পড়ে। তবে সবকিছুই একটা ভারসাম্য বজায় রেখে করতে হবে। মূলকথা হল কলেজের উৎকর্ষতার উপস্থাপনা যেন উৎকর্ষিত ভাবেই করা হয়। উপস্থাপনার ধরন-ধারণ এমন হওয়া দরকার যাতে করে পরিদর্শনকারী দলের কাছে কলেজের সম্পর্কে একটা সুন্দর স্মৃতি তৈরি হয়। আর আমার মনে হয় এতেই সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয়ে যাবে।

যাই হোক, পরিশেষে একটাই কথা বলব যে এটা আমার নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনা। এরমধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে। তবে আমি 'দিশারী' পত্রিকাকে মুখপত্র করে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম এটা মনে করলে মাননীয় কলেজ পরিচালন সমিতি ভেবে দেখতে পারেন। এই কাজ বাস্তবায়িত করার জন্য আমার তরফ থেকে যা যা সাহায্য, পরামর্শ দেবার তা আমি হীরালাল ভকত কলেজ পরিবারের একজন শুভানুধ্যায়ী সদস্য হিসাবে অবশ্যই চেষ্টা করব।

Importance of Yoga

Swapan Saha
Assistant Professor of Philosophy
Hiralal Bhakat College

Yoga is a spiritual science for the integreted and holistic enlargement and magnification of our physical, mental as wel as moral spiritual facts. Yoga is based on the philosophy that is practical and useful for our daily lives. Yoga as one of the greatest things the human mind has ever created. The word yoga originated form "The Sanskrit word yuj" meaning to yoke, join or unite. This entails unifying all facts of the individual-body with mind and soul-to achieve a balanced life. The aim of yoga is the alteration of human beings form their ordinary from to an ideal form. The yogic practices began is the ancient depths of India's past. From this early period the interior attitudes and disciplines which were later acknowledged and given logical expression by Patanjali.

Our present day life is so chaotic and stressful that even thinking of ancient days soothes our heart and brain. The life style of human beings with the passage of time has gradually changed. Science has dominated the present age and the modern man fully depends on it. Physical labour has reduced and ultimately the health of modern man has weekend due to lack of workout. In this age of competition, life is so hard and stressful that man is unable to cope up and hence suffering from various psyclological and mental disorders. Yoga provides the best solution. No other exercise, except yoga, can deal with these problems all together. Yoga manages all problems simultaneously in a brillieant way. To compare with other games and excercises which provide only muscular and cardio-vascular fitness, yoga gives an all round development.

Now a day the definition of health has almost changed. Health is con

sidered as the state of mental and physical, in which the individual is functionally well adjusted inwardly as concerns his body parts, and outwardly as concerns his environments. According to WHO - 'Health is a stdte of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disese or infirmity." Recently this defination has been improved. Yoga along with Naturopathy, Ayurved and Acupressure provide solution of many complicated disease. Yoga is a universal remedy for one who sincerely wants to seek it. Here it is essential to discuss the manner in which techniques of yoga affects the physical and mental fitness; and social well-being of humanity.

Due to modern life style man is suffering from various pastural deformaties and diseases like obesity, Hipertension, Diabetes, Constipation, Allergy, Asthma, Cardiac diseases and etc. Varios poastural deformities like kyphosis, Lordosis, Scoliosis, Knocked Knee etc. can be seen in the modern population. For these deformities congenitel can be there, but the acquired especially the life style of an individual is more responsible than any other reason. The population involved in the chair job and driving generally suffered from khyposis and as a result cervical spondolitis occurd. Yogasanas like Bhajangasana, Matyasayasana, hakrasana etc. yeilds best result but in the advance stage of disease suksham yog in helpful as muscles are too weak to bear the stress of asanas. Obesity, wearing high heals shoes, carrying a heavy weight on the back and pregnancy in some cases results in Lordosis. In Lordosis, Scoliosis and Knocked Knee, Whether acquired or genetic, Yoga provides the best solution. In the present era of science, the human muscles are suffering from atrophy due, to lack of muscular activity.

Various types of stresses and pollution give both to many disease like Hypertension, Depression, Anxity, Insomnia, Allergy, Asthma etc. They too are cured with Asanas, Satkarmas, Pranayam and meditation. The modern lifestyle is the slave of intoxicated drinks and drugs, social and moral ethics

are harassing. In such condition Yan and Niyam of Asthang yog came to
ward to suggest the right path.

The most important advantage of yoga is the physical and men
therapy, the very essence of yoga lies in accomplishing mental peace, e
hanced concentration power and a relaxed state of living. There are ma
health benefits of yoga, studies have shown that yoga can relieve many co
mon and life threatening illness such as arthritis chronic fatigue, diabet
AIDS, asthma, high blood pressure, back pain, weight reduction, obesi
common cold, costipation, skin problems and respiration problems. Yo
also helps in rehabilitaion of new and old injuries. Regular yoga practice bui
mental lucidity and coolness, boost body awareness, relieves stress patter
relaxes the minds and sherpens concentration. The mental-performance al
increases with yoga. Doctors also have suggested that yoga can enhan
cognitive performance.

So yoga is a multidimensional aspect and its scope has increased in th
modern life. Modern research has recognized the scientific roots of yog
practices and yoga has now achieved international recognition and acclai
As we all know, 21st June had declared as Yoga Day in all over the worl
Today yoga is a painstakingly world wide phenomenon, it has taken the wor
by tempest and is gaining reputation day by day. It is enviable that yoga mu
be made an integral part of our educational as well as health care system. Th
rush and burden of our hospitals will be greatly reducced. Hence, there is a
urgent need to populerize Yoga among the human beings. Yoga is reliable wit
our ethnicity and harmonizing to science, so, it is our primary duty to endor
it further.

হীরালাল ভকত কলেজ পরিবারঃ অধ্যাপকমন্ডলীর সাথে ভারপ্রাপ্ত
অধ্যাপক ডঃ গৌতম সেন

টি.এম.সি.পি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন
ইউনিয়ন প্রেসিডেন্টঃ জেহেদি হাসান (ছোটন)

RIDDHI COMPUTER PRINTING
RAMPURHAT, BIRBHUM, (M) 9732123124
www.newtarapress.com